# মায়ার শৃঙ্খল।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ

প্রণীত।

৬ নং ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেসে"

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২১।

[ মূল্য ॥৵০ দশ আনা। ]

# নিবেদন।

মায়ার শৃঙ্খল ছাপা শেষ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কয়েক স্থলে ছাপার ভুল রহিয়া যাওয়াতে, কেমন একটা-ভারি খুঁৎ বোধ হইতেছে। রসজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ব্যাপারটা যদিও ততটা গুরুতর নয় কিন্তু একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, কি নূতন পুরাতন যে কোন লেখকের—পক্ষে তাহাদের পুস্তকে ছাপার ভুল ও ব্যাকরণ ভুল রাখা একবারেই অবাঞ্ছনীয়। প্রুফ দেখার সুযোগাভাব, প্রভৃতি আজুহাত গুলা একবারেই অন্যায় রকমের ক্ষমা প্রার্থনা।

তথাপি আমি আমার সমস্ত ক্রটী, সমস্ত অপরাধ মাথায় পাতিয়া লইয়া প্রার্থনা করিতেছি সাহিত্যের আসরে এই নূতন খেলোয়ার নব অভিযানটী সহৃদয়তার দ্বারাই সমর্থিত হউক এবং দ্বিতীয়বারের জন্য নূতন করিয়া অনুতাপ সঞ্চয় করিতে বেচারা গ্রন্থকার নিষ্কৃতি লাভ করুন। নিবেদন ইতি—

বাবুনপুর মালডাঙ্গা, বর্দ্ধমান
ভাদ্র চতুর্দ্দশী ১৩২১।

গ্রন্থকার।

# মায়ার শৃঙ্খল।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহিমের সহিত প্রিয়বালার এই সর্ত্ত ছিল, গ্রীষ্মাবকাশ কি পূজাবকাশে কলেজের ছুটি হইলেই সে দেশের বাড়ী আসিবে, স্ত্রীর সহিত প্রথম পরিচয়ের পর হইতে মহিম একথা অক্ষরে অক্ষরে পালিয়া আসিয়াছে, কখন কথার খেলাপি হয় নাই। যখন সে গ্রামের এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়িত, তখন তাহার সহিত প্রিয়বালার বিবাহ হয়, এখন বি, এ, পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে এবং স্ত্রী প্রিয়বালাও উনবিংশ হইতে বিংশে পদার্পণ করিয়াছে।

এবার কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের সময় স্ত্রীর বিশেষ আদেশ হইল।—ছুটি হইবার পর একটী দিনও যেন বিলম্ব করা না হয়। তাহার জন্য চক্ষের জল দিয়া—মাথার দিব্য দিয়া পত্রের ছত্রে ছত্রে অনুরাগের তীব্র মাদকতা মিশাইয়া, অনুরোধের পর অনুরোধ পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাই মহিমের এবার বিশেষ তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্বাভাবিক টানে যতটা না হউক, স্ত্রীর পিতার অর্থের টানে প্রায়ই তাহার পত্নীপ্রেম সংযমের মাত্রা অতিক্রম করিত। ইহার জন্য অনেক স্থলে তাহাকে হাস্যাস্পদও হইতে হইয়াছে, কিন্তু সে ভাল-রূপেই জানিত, শ্বশুরের কাছে সহস্র মিনতিতে যাহা না হয়, স্ত্রীর এক বিন্দু চক্ষের জলে তাহা অনায়াসেই সাধিত হয়। ধনী শ্বশুরের এক মাত্র কন্যা প্রিয়বালা, অথচ তাহারও সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। শ্বশুরের অর্থেই তাহাকে পড়া শুনা করিতে হইতেছিল। এই সব নানা কারণে স্ত্রীর প্রতি তাহার ভালবাসাও যেরূপ প্রবল ছিল, সঙ্কোচ-দুর্ব্বল শ্রদ্ধাটীও তেমনি প্রগাঢ় ছিল।

বিছানা পত্র ও ট্রাঙ্ক গোছাইবার ধূম দেখিয়া ক্ষিতীশ ও শশাঙ্ক কহিল। কি হে! এবার যে বড় তাড়াতাড়ি।

মহিম হাসিয়া কহিল,—কি ক'রবো ভাই। রাণীজীর কড়া হুকুম—অমান্য করবার ত উপায় নাই।

অবিবাহিত ক্ষিতীশ কহিল,—আমরা ত বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রীর সব-তাতেই তোমার যেন অনেকখানি বাড়াবাড়ি। কেন? স্ত্রী কি কারু হয় না? এত কথার বাধ্য হতে যাবো কেন?

মহিম কহিল,—চিরকাল আইবুড় কার্ত্তিকটী হ'য়ে থাকলে, স্ত্রী যে কি জিনিষ, কি ক'রে বুঝবে ভাই? তারপর হাসিয়া কহিল। ওহে একটু কথার বাধ্য হওয়া ভাল। তারাও বাধ্য থাকে।

ক্ষিতীশ কহিল,—কক্‌খনই না। আমরা এমন বুঝতে চাই না। তার চেয়ে প্রাণ দেব না প্রাণ নেব না, বলাই ঠিক নয় কি?

মহিম আনাড়ীদের সহিত তর্ক হইতে নিরস্ত হইয়া সার্টটী গায়ে দিয়া, চাদরখানি কাঁধে ঝুলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ক্ষিতীশ ও শশাঙ্ক কহিল,—কোথায় হে। প্রেয়সীর জন্য মুর্গিটার পথে নাকি? মহিম শির-সঞ্চালন করিয়া কহিল,—না তা নয়, তবে বাড়ী যাবো, দেশের একটী লোকের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্চি। আসলে কিন্তু কথাটী তাহাই, প্রেয়সীর মনোরঞ্জনের জন্য গোটা কয়েক সাবান বাসতৈল কিনিতে বাহির হইয়াছিল। প্রেয়সীও যে এ সব চাহিত তাহা নহে, তবে এই সব রঙ্গীন খেল্‌নাগুলি স্ত্রীর বাক্সে সাজাইয়া দিয়া, তাহার সুকুমার চিত্তবৃত্তির একটী চরিতার্থতা সম্পাদন হইত।

গোলদীঘির ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পরিচিত কেহ আছে কিনা চাহিয়া দেখিতেছে,—এমন সময় এক বিধবা প্রৌঢ়া নারী আস্তে আস্তে মহিমের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীর পরিধানে সাদা ময়লা কাপড়। দেখিলেই মনে হয় যেন ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। মহিম ভাবিল, হয়ত নারী পথ ভুলিয়া তাহার কাছে পথের সন্ধান লইতে আসিয়াছেন, উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল।

নারী মাথার কাপড় একটু টানিয়া কহিলেন, বাবা আমি রোজই এসে থাকি, রোজই তোমাদের পানে চেয়ে চ'লে যাই। আসল কথাটী বলতে পারি না। কলেজ থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে যে যার আপনার ঘরে যাও, তাই দেখি। মহিম বিস্মিত হইয়া নারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নারীও তাঁহার সঙ্কোচ দমন করিয়া কহিলেন,—যদি অভয় দাও বাবা, তবেই বলি!

মহিম কহিল,—বলুন না? আমাদের কাছে, আপনার আবার সঙ্কোচ কি?

নারী কহিলেন—তা হলে বাবা, যদি দয়া করে একটীবার আমার সঙ্গে আসো, তবেই আমার বলা সার্থক হয়'; নইলে ব'লেও আমার কোন লাভ নাই।

মহিম ভাবিল,—নারী নিশ্চয় তাহার কাছে কিছু প্রার্থনা করিবে, পকেটে কয়টী টাকা আছে, টিপিয়া দেখিল।

নারী কহিলেন,—কি ক'র্‌বো বাবা,না নিয়ে গেলে তোমায় ঠিকমত বোঝাতে পার্‌বো না। আর তুমিও ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পার্‌বে না কেন ডাকলাম। এত বড় কথা সে!—

কথা বার্ত্তার স্বরে এমন একটা ঝাঁঝ বহির্গত হইতেছিল;—যাহা সেই সমস্ত লোকের কণ্ঠ দিয়াই বহির্গত হয়,—যাহারা প্রবল একটা দাহে লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—

মহিম ভাবিল—ক্ষতি কি, নাই হোক মুর্গিহাটায় যাওয়া, যদি এক দুঃখিনীর কাহিনীটা শুনিয়া আজকের বৈকালটা কাটাইয়া দেওয়া যায়, মন্দ কি? কিছু তাঁহার সাহায্য হউক না হউক, তবু দুঃখের কাহিনীটি শুনিয়াও ত লাভ আছে। এই কাহিনীই যে ভিতরকার মানুষটীকে মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করে।—মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি জাগাইয়া তুলে। মহিম কহিল—চলুন, গেলে যদি আপনার কিছু উপকার হয়, আমার কোন আপত্তি নাই।

নারী কৃতজ্ঞতায় গলিয়া কহিলেন—তাইতে ভাবি—সংসারটা ত একবারেই সয়তানপুরী নয়, মানুষও আছে বৈ কি? রমণী অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন আর মহিম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কয়েকটা গলি পার হইয়া, খানিকটা পড়া যায়গার সম্মুখে একটা অর্দ্ধভগ্ন বাড়ী দেখা গেল। নারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া কহিলেন, বাবা ঐ আমার কুঁড়ে ঘর, ঐ খানেই আমার সাত রাজার ধন মাণিকটী আছে।

মহিম কথাটী তখন ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশিয়াই বুঝিল, সাত রাজার ধন মাণিকটী কি? বসন্ত-প্রভাতের বিকচোন্মুখ শতদলটীর মত একটী কন্যারত্ন ভাঙাঘর আলো করিয়া রহিয়াছে।

বালিকা বসিয়া বসিয়া গুপারি কাটিতেছিল, মহিমকে দেখিয়া গুপারির ডালাটী হস্তে তুলিয়া মায়ের কাছে আসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অনেকখানি লজ্জাই তাহার মধ্যে ছিল।

প্রৌঢ়া কহিলেন, এইটী আমার মেয়ে বাবা ঐ একরত্তি অন্ধের নড়ী। ওকেই দেখাবার জন্য তোমায় নিয়ে এসেছিলাম, এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পারি নি, টাকা নাই। মায় ঝীয়ে গুপারি কেটে দিন কাটাই। এই বাড়ী-রত্তি ছিল, তাও আর থাকে না। রোগে ভোগে বাঁধা পড়েছে, শুনচি বাবা তোমরা নাকি সব বিনা পণে বিয়ে ক'রবে বলেছো, তাই ডেকে কথাটা ব'ল্লেম, এখন দুঃখিনীর পানে চাইবে ত?

মহিম ভাবিল—কি উত্তর দেয়,—সে যে বিবাহিত, তাহার ত আর ভুল নাই, তবে—কি জাতি কি গোত্র তাহারই বা পরিচয় কি! নহিলে হাতে পাত্রও দুই একটী রহিয়াছে। কি উত্তর দিবে, ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময়ে প্রৌঢ়াই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবা ভাবছো কি, জাতি কি গোত্র আমাদের, তা আমি ব্রাহ্মণেরই মেয়ে, খড়দ মেল, বিশ্বনাথ ঠাকুরের সন্তান। আদি বাস ছিল গুপ্তিপাড়া। আমার শ্বশুর চাকরী করিতে এসে এইখানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। তুমিও যে ব্রাহ্মণের ছেলে, তা তোমার চেহারা দেখেই টের পাওয়া যাচ্চে। এখন এ গরিবের পানে চাইবে ত বাবা?

মহিম বালিকাটীর দিকে চাহিয়া করুণস্বরে কহিল,—কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে। আমার বিবাহ হয়ে গেছে, তবে আমার বন্ধুদের

ব'লে নিশ্চয় রাজী করাতে পারবো। আমি ভরসা দিচ্ছি, কিছু ভাবনা নাই। এমন সুন্দরী মেয়ে,—কেউ অমত ক'রতে পারবে না। করুণাময়ীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। আজ তাঁহার যে কত দুঃখ কত দৈন্য, আর এই মায়ালতা যে তাঁহার কত অন্তরের সামগ্রী, তাহা কি করিয়া এই গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণযুবককে জানাইবেন। মায়ার মাথায় হাত দিয়া আর মহিমের দিকে চাহিয়া নীরবেই তাঁহার চক্ষের জল ঝড়িয়া যাইতে লাগিল।

মহিম কহিল—চিন্তা করিবেন না, আমার উপরেই এ ভার রইল বলিয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল!—

করুণাময়ী কহিলেন—না বাবা, এরি মধ্যে ত তোমার যাওয়া হবে না; তোমায় সব জানাবো, কতদিন কত জনাকে ডেকেছি, কেউ এ দুঃখিনীর দিকে চায় নাই—সবাই আমার পুঁজির দিকে চেয়েছে, আর চলে গেছে। তুমি যখন ভরসা দিচ্চো, তখন সব না ব'লে কি নিশ্চিন্ত হতে পারি? বড় ঘরেরই ঘরণী ছিলাম বাবা! আজই যেন কিছু নাই! স্বামী এক শত টাকা মাইনের চাকরী ক'রতেন। কিন্তু তিনিও পরের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়ে আমাদের পথে দাঁড় করিয়ে চলে গেলেন, আর আমি এই মেয়েটাকে নিয়ে পাথারে ভাসছি, আত্মীয় স্বজনও আছে, কেউ একবার খোঁজ নিয়েও দেখে না। একবার একটা তেজবরে পাত্র যুটেছিল, পাঁচ সাতটী ছেলে তাঁর, বিনা পয়সায়—বিবাহ ক'রতে চেয়েছিলেন, আমি ত প্রাণধরে আমার সাধের মায়াকে সে বরে দিতে পারলেম না, ভাবলেম মেয়েকে বুকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব সেও ভাল, তবু তাকে দণ্ডে দণ্ডে মরতে দেব না। বাছার একটা একটা দীর্ঘশ্বাস যে আমার বক্ষের শেল বাবা?—

কথাটী শুনিতে শুনিতে মায়ার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু মাকে শুদ্ধ তাহার জন্য এই দুর্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি দিবারও কোন সুযোগ তাহার হাতে ছিল না। কারণ সে যে বাঙ্গালী ঘরের কন্যা হইয়া জন্মিয়াছে, বিবাহ না করিলে তাহার ত নিষ্কৃতি নাই।—সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিল।

মহিমেরও মনে হইল, যেন এত বড় দুঃখের সম্মুখীন সে কখনও হয় নাই। যাহার পশ্চাতে একটা সহানুভূতি নাই,—করুণা নাই।—খানিক চুপ চাপ থাকিয়া সহানুভূতির স্বরে কহিল,—সে বেশ ক'রেছেন। আপনার মেয়ের ভালই হবে, এ আমি নিশ্চয় ব'ল্লেম। বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে খোঁজ ক'র্‌তে হবে না; আমিই খোঁজ ক'রে এসে সব ব'লে যাবো। আস্‌ছে বৈশাখের মধ্যেই নিশ্চয় বিবাহ দিইয়ে দেব। এক পয়সা আপনার খরচ নাই। বলিয়া আপনার ঠিকানা লেখা একখানা কাগজ করুণাময়ীর হস্তে প্রদান করিল।

করুণাময়ী কৃতজ্ঞতায় গলিয়া কহিলেন—বাবা যদি গরিবের দিকে চাইলে, তবে মিষ্টি মুখ না করিয়ে দিয়ে ত কিছুতে ছাড়তে পারবো না, বলিয়া কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, মা তুমি দুটো পান সেজে দাও; আর আমি খাবার নিয়ে আসি, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

মহিম বারণ করিতে যাইতেছিল—এ সবের কি দরকার? কিন্তু করুণাময়ীর একান্ত আগ্রহ দেখিয়া সাহস করিল না। মায়ালতা ঘরের মধ্যে পান সাজিতে লাগিল। আর মহিম সেই মায়ালতার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—মায়ের হৃদয়ের কি অগাধ স্নেহ দিয়াই এই লতাটী পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখিনী মাতা নিজে শত দুঃখ শত যন্ত্রণা সহিয়া আছেন, কিন্তু কন্যাটীকে দৈন্যে ম্লান হইতে দেন নাই। ভূপতিত

মরণোন্মুখ বৃক্ষ যেমন বুকের শেষ রুধির-ধারা দিয়া কিশলয়টীকে বাঁচাইয়া রাখে, এ লতাও তেমনি মাতার স্নেহ-পক্ষপুট-ছায়ায় পাঁজরের মধ্যে হৃদপিণ্ডটীর মত এক অক্ষয় অমৃত ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া আছে. মায়ের নিজের পরিধানে ছেঁড়া ময়লা কাপড়—কিন্তু মায়ালতার পড়নে টেনা নয়। এই মায়ের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া মহিমের সমস্ত হৃদয় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে এই মাতৃপদে আপনাকে লুটাইয়া দিল। করুণাময়ী, অনেক প্রকারই যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন? মহিম খাইবে কি? শুধু এই মায়ের দিকে চাহিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন মা, সন্তানের জন্য যাঁহার লজ্জা সরম দৈন্য কিছুরই জ্ঞান নাই। ভাবিল—স্বর্গ আর কোন খানে?—কোনমতে একটু নিয়মরক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং যাইবার সময় দুইটী টাকা করুণাময়ীর পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল।

করুণাময়ী টাকা দুটী মহিমের হাতে গুঁজিয়া দিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন,—বাবা পরের বাড়ী রেঁধে, সুপারী কেটে, দিন গুজরান করি যদিও, তবু তোমার মত ছেলের মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার সাধ্য কি নাই?—

মহিম আহত হইয়া কহিল,—"দুখের সংসার ব'লেই দিইনি মা, ভক্ত যেমন ভক্তিভরে দেবীদ্বারে প্রণামী রেখে যায়, মনে জেনেও এ তার কিছুই দেওয়া নয় ব'লে—এও তেমনি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।"—

করুণাময়ী ভাবিলেন, বিবাহ হউক না হউক, তবু যে একটা মানুষের সহিত পরিচয় হইল;—ইহাই তাঁহার যথেষ্ট লাভ।—

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষিতীশ ও শশাঙ্ক ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল,—মহিম আসিলে তাহাকে দুটো কড়া কথার সঙ্গে খুব খানিকটা পরিহাস করিয়া লইবে। তাহারা কিছুতে ঠিক করিতে পারিতেছিল না ; দেশের এত সহস্র কাজ পড়িয়া থাকিতে কি হেতু সামান্য এক স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য মানুষের এতটা প্রয়াস নিয়োজিত হইতে পারে ? দুই জনেই সৌখীন দেশ-সেবক। সভা সমিতি সম্মিলনী কোনটাতেই তাহাদের যোগাযোগের অভাব ছিল না।—

ভাদ্রের ভরানদীর উপরে—পালভরা নৌকার মত তাহাদের হৃদয় তরণী যেন কোন মহাতীর্থের উদ্দেশে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল। সে উচ্ছ্বাসে তাহারা দেশের জন্য সকল রকমেই আত্মদান করিতে প্রস্তুত ছিল! ধন মন তন ত আগে হইতেই দেওয়া ছিল,—সম্প্রতি বিবাহ না করিয়া সংসারের সুখটা হইতেও বঞ্চিত থাকিয়া দেশের জন্য যে কেমন করিয়া লাগিতে হয়, তাহারই একটা আদর্শ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল!—তাহারা বলিয়াছিল—যে উদ্যম স্ত্রী সংসারের জন্য লাগাইবে, সেটাকে দেশের কাজে লাগাইয়া সফলতা-টাকে আরও সফলতার দিকে বাহিয়া লইয়া যাইবে। এই কারণে বিবাহিত বান্ধবদিগকে তাহারা একটু কৃপার চক্ষেই দেখিত। মহিম প্রভৃতির দিকে চাহিয়া ভাবিত, বদ্ধ জীব সংসার আর স্ত্রী লইয়াই মগ্ন হইয়া আছে, জীবনের যথার্থ শ্রেয়ঃ অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতেছে।

মহিম বাসায় প্রবেশ করিতেই ক্ষিতীশ ও শশাঙ্ক সমস্বরে হেলাভরে

বলিয়া উঠিল—কি হে এবার প্রেয়সীর জন্য কি ঘুসের বন্দোবস্ত করলে? সোনা দানা দেবার ত সাধ্য নাই, বাস তেল আর তরল আলতা তোমাদের জন্যই বাজারে রোজ রোজ দরে চ'ড়ে উঠ্‌ছে!—

মহিম আপনার শূন্য পকেট ও শূন্য হাত দেখাইয়া কহিল—প্রেয়সীর জন্য কিছু হোক না হোক, তোমাদের একজনাকার জন্য যে, একটা রত্ন যোগাড় ক'রেছি তা নিশ্চয়!—সার্টটা আলনার উপর ঝুলাইয়া রাখিয়া কহিল,—"তোমাদের যাকেই হোক সে রত্ন-হারটী গলায় তুলতেই হবে!"

ক্ষিতীশ ও শশাঙ্ক উভয়ে মহিমের দিকে চাহিয়া কহিল, কিহে—ব্যাপারটা খুলেই বল না? সোণা হীরে যে নয়ই, তা ত কথার ভাবেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্চে। স্ত্রী—রত্ন নাকি?—

মহিম কহিল, হাঁ স্ত্রী—রত্নই বটে, কিন্তু আঁধার ঘর আলো ক'রে আছে, যে সেই হার গলায় প'ড়বে সেই ভাগ্যবান্। বলিয়া পথে বাহির হইয়া যাহা ঘটিয়াছিল, বলিয়া গেল। ক্ষিতীশ ছিল বিবাহের উপর বিষম বিতৃষ্ণ; সে হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—তা হলে আমার তার জন্য মাথা ব্যথার কোন দরকার নাই। কারণ, জীবনের পথে ও রত্নটাকে খরচের খাতেই রেখে এসেছি, এখন শশাঙ্ক-দার অভি-রুচি!—

শশাঙ্ক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল,—আমারও ত তাই ভাই, দেশের জন্য যে জীবন বাঁধা আছে। এ হৃদয়ে দেশমাতার প্রতিষ্ঠা-ব্যতীত ত আর কারু প্রতিষ্ঠা নাই!—মহিম বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, নাই উত্তম।—কিন্তু দেশের দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করলে বুঝি সেটা দেশেরই কায করা হয় না? দেশের জন্য তবে জীবনটা বাঁধা

আছে কেমন শুনি? শুধু বুঝি দেশের আকাশ বাতাসেরই সঙ্গেই তোমাদের যোগ, মানুষের সঙ্গে নয়।—এ কেমন রকম দেশভক্তি আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।—

ক্ষিতীশও একটু না দমিয়া বরং রুক্ষস্বরেই কহিল, বুঝবে কোথ থেকে, স্ত্রীকেই যে জীবনের সর্ব্বার্থসাধিকে ক'রে জেনেছ।

মহিম কহিল, তা জেনেছি। সত্যই জেনেছি অস্বীকার ক'রবার উপায় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে হৃদয়টা যে ভালবাসাময় হ'য়ে গেছে, তার খবর রাখো? পথের দুলাল যে সেও বক্ষের দুলালের মত বুকটা জড়িয়ে ধরে যে, অনাথিনী কাঙ্গালিনীর মধ্য হ'তেও আমার প্রিয়-তমার কলকণ্ঠ শুনতে পাই, তোমরা তা পাও? বলিতে বলিতে তাহার স্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কহিল—হৃদয়টাকে তখন আর শূন্য মায়া দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারি না ভাই। যা সত্য—যা সুন্দর তাই চক্ষের সম্মুখে সত্য হয়ে—স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়।—আর তোমরা,—তোমরা হয় ত শূন্য মায়া দিয়ে—ভাবুকতা দিয়ে দিব্য একটা ভাব ভোর ভোর কুহেলিকাচ্ছন্ন দেশমাতার এক রূপক মূর্ত্তি গ'ড়তে পারো, তাতে অনেক খানিই করুণ রস জাগাতে পারো; আমি তা পারি না।—চোকের সামনে যেটা সত্য, সেইটুই সত্য হয়ে—পরিপূর্ণ হয়ে জেগে ওঠে। কোথায় ভেসে যায় তখন শূন্য ভাবুকতা—জীবনটাকে শুধু ত্যাগ করে বিলিয়ে দেবার জন্যই যেন তাগিদ আসতে থাকে! ভেবে দেখো, অভাগিনী কন্যাদায়গ্রস্তা জননীর আজ কি অবস্থা।—

কথাটা দেশভক্তদ্বয়কে স্পর্শ করিল কি না সন্দেহ। তবে খবরের কাগজে এবিষয়টী লইয়া যে অনেকখানি করুণ রস সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, এটা তাহারা বুঝিল। ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিল—আচ্ছা যদি কোথাও পাত্র না যোটে, তা হ'লে কি ক'রবে ভেবেছো? মহিম

কহিল, কোথাও যুটবে না? এমন কি কথা আছে! শশাঙ্ক মুখে হয় ত না ব'লতে পারে,কিন্তু অস্বীকার ক'রতে পারবে কি?—ক্ষিতীশ কহিল, ধরোনা,( যদিই শশাঙ্কের বাপ মায়ের না মত হলো কি শশাঙ্কেরই যদি মেয়ে পছন্দ না হলো?—

মহিম মুখে একটা আতঙ্কের ভাব টানিয়া শশাঙ্কের দিকে চাহিয়া কহিল,—কি শশাঙ্ক তোমার মত হবে না?—কুলশীলের কিছু ভাবনা নাই, ব্রাহ্মণের ঘরের অমন পরীর মতন মেয়ে? দোষ গরিব! ভাই, উপকার করতে হলে গরিবেরই উপকার করতে হয়। মা বাপই বা ছেলের এ ধর্ম্মবুদ্ধিতে কেন হাত দিতে যাবেন?- শশাঙ্কের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সত্যি শশাঙ্ক, যদি একবার দেখে এসো ত সে মা ও মেয়ে ভুলতে পারবে না। চল যাবে?—এখান হ'তে বেশী দূরও নয়—দেখিয়ে নিয়ে আসি!—

শশাঙ্কও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, মহিমদা তুমি পাগল হ'লে নাকি? তোমার সব তাতেই কি বাড়াবাড়ি?—

মহিম কহিল, বাড়াবাড়ি নয় ভাই সত্যই,—যতক্ষণ সেই বিধবার মায়ালতাটীকে কোন সৎপাত্রস্থ ক'রতে না পারবো, ততক্ষণ আমার সুস্থির হবার কোন উপায় নাই। অভাগিনী মা লোকের দোরে দোরে গেছে, তবু কারু কি দয়া হয়েছে! বিনা পয়সায় কেউ ছেলে দিতে রাজী হয় নাই। অথচ তাঁর আজ খেতে কা'লকার সংস্থান নাই। বাঙ্গলা দেশের মানুষগুলো যেন পাষাণ হ'য়ে গেছে?

অনেক পীড়াপীড়িতে শশাঙ্ক যদিও বিবাহ করিতে রাজী হইল বটে,কিন্তু পিতা মাতার ওজর করিয়া গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত সময় চাহিল। মহিম সময় দিয়া বার বার তাহার কাছে স্বীকারোক্তি লইয়া কহিল,—যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে বল, এখনও উপায় আছে।

শশাঙ্ক ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, কথার খেলাপ সে করিবে না। তবে পিতা মাতার অনুমতিটী মাত্র সে লইবে! —মহিম তবু আর দুই একজন বন্ধুকে বলিয়া—তাহাদের কাছ হইতেও স্বীকারোক্তি লইয়া—করুণাময়ীকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।—

ছুটি প্রায় এক সপ্তাহ হইয়া গিয়াছিল। একয়টা দিন মায়ালতার জন্য পাত্র দেখিতে ও কথা স্থির করিতে কখন যে কি ভাবে দিন কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার হুঁসই ছিল না। সহসা প্রিয়বালার অনুরোধ ও পত্রগুলার কথা মনে পড়িয়া লজ্জিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, প্রিয়বালাকে কিই বা বলিবে?—মিথ্যা বলিতে স্ত্রীর কাছেও তাহার কেমন বাধো বাধো ঠেকে। ঠিক করিল—সত্যই বলিবে এবং সমস্তটা প্রকাশ করিয়া বলিলে প্রিয়বালাও ক্ষমা না করিয়া পারিবে না, তাহারও ত মানুষের হৃদয় আছে।—ব্যাগটা হাতে লইয়া বাহির হইয়াছে—ক্ষিতীশ পিছু ডাকিয়া কহিল। ওহে মহিমবাবু, শোন শোন,—বাড়ী হতে ফিরে এ'সে দেখ যদি কারু সে বিবাহে মত নাই—তা হ'লে কি ক'রবে ঠিক করে যাচ্ছো? শুভ যাত্রার পথে সহসা এই নিষ্ঠুর রকম "বদির"—আঘাতে মহিমের হৃদয়টা উগ্র হইয়া উঠিল। তাহার উপরে—ক্ষিতীশের মুখেও প্রবল রকমের একটা ব্যঙ্গ-ভাব ঈষদ্ধাস্যের সহিতই অভিব্যক্ত হইতেছিল। ঝাঁ—ঝাঁ—করিয়া মুখে যা আসিল, বলিয়া গেল। কহিল, তা হলেও মনে ক'রেছ আমি পেছপাও হবো? ককৃখনই না, যখন কথা দিয়েছি, তখন আমায় কথা রাখতেই হবে। কেউ না বিয়ে ক'রতে রাজী হয় আমিই বিয়ে ক'রবো।—বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল!—ক্ষিতীশও হাসিতে লুটি পুটি খাইয়া কহিতে লাগিল—বেশ! বেশ ভাই!—

মহিম রাস্তা হইতেও সে প্রবল হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইল, কিন্তু আর ফিরিয়া গেল না। কেবল একবার ভাবিল, মানুষের প্রবল একটা দুঃখ লইয়াও মানুষে কি করিয়া এমন নিষ্ঠুর রকম পরিহাস করিতে পারে! সারা রেল পথটাই মহিমের কর্ণে ক্ষিতীশের সেই প্রবল হাসিটা থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম রাত্রিটা মান অভিমানে কাটিয়া গেল। স্ত্রী প্রিয়বালা জল, পান, আহার সব দিল বটে, কিন্তু ঘোমটা খুলিয়া স্বামীর কাছে একেবারেই আপনাকে মেলিয়া ধরিল না; যেন তাহার ভিতরে অনেকখানি অভিমানই পুঞ্জীভূত ছিল।

মহিম ধনী শ্বশুরের কন্যারত্নটীকে ভাল করিয়াই চিনিত। বুঝিল যে এ দারুণ অভিমান—এক ত আসিবার নির্দ্দিষ্ট দিনে আসা হয় নাই, তাহার উপর বিলম্ব হওয়ার কারণ একখানা পত্র লেখাও হয় নাই। রাগ হইবারই কথা!—

কি করিয়া স্ত্রীর মান ভাঙাইতে হয়, সে বিদ্যাটাও তাহার সাধিয়া সাধিয়া ভালরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিত, গরিবের ছেলে ধনবানের কন্যাকে দুটো মিষ্টি কথা দিয়া, দুটো হাতে ধরিয়া সাধিলে যদি মন পাওয়া যায়—তবে ততটা দোষেরই বা কি?—আর জমীদারনন্দিনীও এ সাধাটাকে ততটা দূষ্য বলিয়া মনে করিত না। ভাবিত, এটা তাহার—ন্যায্য প্রাপ্য। কারণ, সে যে তাহাদের সমস্ত সংসারের কতখানি, তাহা ত তাহার স্বামীরও অবিদিত নাই।

সে যদি, এখন বাঁকিয়া বাপের ঘরে চলিয়া যায়—তবে সমস্ত সংসারটাকে কতখানি অসুবিধার মধ্যেই না পড়িতে হইবে? আপদে বিপদে প্রিয়বালার—বাপ শিখরেশ্বর ব্যতীত যখন তাহাদের একদণ্ড উপায় নাই।

সমস্ত সংসারটাই যে প্রিয়বালার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে, এহেন প্রিয়বালাকে মহিমচন্দ্রের হেলাস্তা করিয়া একখানা পত্রও লেখা হইল না, কাযটা কিন্তু মহিমের ভাল হয় নাই।

প্রিয়বালা মহিমকে ঠেলিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, যাও যাও। আমায়—সাধতে হবে না, যাকে সাধলে তোমার সুখ হয়, তাকেই সাধগে।—জানি ত আমার মরণই উচিত ছিল। তা হ'লে পাঁচ হাতে বেশ স্বচ্ছন্দে খেতে পারতে।—মহিম কাতরস্বরে কহিল,—প্রিয়, এটা কি তোমার ভাল হচ্চে? আমি কি করলাম তাই বলো? বল্লমই ত সেই গরিব কন্যাদায়গ্রস্তা অভাগিনীর জন্যই বিলম্ব হয়ে গেল!

প্রিয়বালা একটা তীব্র বাঙ্গের সুরে কহিল,—আর ন্যাকামিতে কায কি? আমি ও মিথ্যের ভুলি না? বুঝেছি সব, এখন আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে কি না বলো?—

মহিম কহিল, প্রিয়! এত চটে ওঠো কেন? তোমার ভালতেও রাগ মন্দতেও রাগ? সাধতে সাধতে;—

প্রিয় তাড়াতাড়ি মহিমের মুখে দুই হাত চাপা দিয়া কহিল,—তুমি সাধ কেন? আমি সাধতে বলি?—তুমি যদি ও কথা বল ত দিব্যি! আমার সঙ্গে তুমি কথা পর্যন্ত ক'য়ো না। এই এতদিন যে দেখা পাই নাই, মরে গিয়েছিলাম?—কিছু না উপায় হয়—আমার বিষ ত আছে! বলিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল!—বড় বড় ডাগর চোখ দুটী হইতে মুক্তার মত জলের ধারা বহিয়া গেল!—

মহিম দেখিল, নারী তাহার ধৈর্য্যের শেষ সীমাটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর এখন কড়ামিঠা গোছ সাধাসাধিতে নয়—তাহাকেই গলিয়া জল হইয়া, তাহার সব অভিমান, সব ব্যথা মুছাইয়া দিতে হইবে।

দুই বাহুদ্বারা প্রিয়বালাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল।—প্রিয়, প্রত্যেকবার ক'লকাতা হতে এসে যদি তোমায় প্রত্যেকবারই নতুন ক'রে আবিষ্কার করতে হয়, তা হ'লে আমার সাধ্যে ত কুলায় না?—

প্রিয়বালা হাত ছিনাইয়া লইয়া কহিল, না কুলোয়—আমি কি তোমার পায়ে ধরে মশাই মশাই,করে বলি যে,—ওগো—তুমি আমায় সাধো। দেখ না,—কথার ছিরি, শুনলে পিত্তি শুদ্ধ জ্বলে যায়।

মহিম সস্নেহে অভিমানিনী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল, না না আমারই দোষ। আমিই বুঝতে পারি না। সত্যি, প্রিয়বালা, আমি ভেবে ঠিক ক'রতে পারি না, কি ক'রে তোমার মনের মত হই। তোমার কিসে যে সুখ, কিসে যে অসুখ, এতদিন ধরে তার টেরই ক'রতে পারলেম না। তবু কিন্তু তোমায় না ভালবেসেও পারি না। তোমায় ভালবেসে সুখ, তোমার ভালবাসা পেয়ে সুখ!

প্রিয়বালাও গুম হইয়া শুনিতেছিল। সেও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না, তাহার কিসে সুখ, কিসে অসুখ? যতই কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ততই অস্থির হইয়া পড়িতেছিল। সত্যই ত, স্বামী ত তাহাকে দোষের কথা কিছুই বলেন নাই। তবে এতক্ষণ ধরিয়া এ সাধ্য-সাধনাটুকু আদায় করিয়া লইতে তাহার এ নিষ্ঠুর রকম অভিলাষ কোথা হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল?

স্বামী দরিদ্র আর সে ধনীর কন্যা। তা হইলেই বা "বাপ রাজা ত

রাজার ঝী। স্বামী ত তাহার সব সম্পদ—সব ঐশ্বর্য্যের উপরে, তবে? কেন মুখ দিয়া একটা সরস কথাও বাহির হয় না? এত প্রাণ ঢালিয়া দেবতা তাহাকে প্রেমের পুষ্পহার পরাইতে আইসে আর সে কিনা তাই নির্ব্বোধের মত ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে চায়। যে ভালবাসা রাজরাণীর ও শত জন্মের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী সে তাহা লইয়া কোন্ প্রাণে যে নিষ্ঠুর রকম উল্লাস অনুভব করে—সেইটেই বুঝিয়া ওঠা দুঃসাধ্য। আশ্চর্য্য এ পাষাণী!—ঈষৎ অবনত হইয়া, একবার বক্রভঙ্গে মহিমের দিকে চাহিয়া তারপর যেন কোন কারণে হঠাৎ আহত হইয়াই সেখান হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

মহিম কহিল কোথা যাচ্চ প্রিয়বালা?

প্রিয়বালা তাহার কোন উত্তর দিল না। খানিকপরে একটা রেকাবিতে কয়েকটা মিষ্টান্ন ও গ্লাসে একগ্লাস জল লইয়া আসিয়া মহিমের সম্মুখে রাখিয়া দিল। এবং নিজেও কিছুদূরে পানসাজার জায়গাটার কাছে বসিয়া পান সাজিতে লাগিল!

মহিম ব্যাপারটা বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল তুমি না বল্লেত আমি খাচ্চ না প্রিয়।

প্রিয় এবার পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল তুমি খাও। মা আমার তোমারই জন্য নিজ হাতে সন্দেশ গ'ড়ে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। তুমি ত আসবে বলে এলে না, আমি কতদিন ধরে জুগিয়ে রাখি?—সবই খারাপ হয়ে গেছিল, গোটাকতক মাত্র ভাল ছিল!

মহিম হাসিয়া কহিল তবে যে বলো তুমি—আমায়—ভাল বাস না!

প্রিয়বালা সে কথার কোন উত্তর দিল না। মহিমের খাওয়া হইতেই তাড়াতাড়ি জলটা মহিমের হাতে ঢালিয়া দিয়া ডিবাশুদ্ধ পান

গুলা লইয়া আসিল। মহিম পান লইতে হাত পাতিলে দিল না। একটা পান মহিমের মুখে তুলিয়া দিল। তারপর খাবারের ডিসটাকে নিজ হাতে উঠাইয়া—সেই স্থানটা দিব্য করিয়া—পরিষ্কার করিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল!

মহিম তখন খাটের ধারে পা ছড়াইয়া দিয়া স্ত্রীর এই ভাব দুর্ব্বল সদা অভিমান ক্লিষ্ট নারী—জীবনটার কথা আলোচনা করিতেছিল।

প্রিয়—তাহার স্বামীর পায়ের কাছটাতে, স্বামির একটা পায়ে হাত দিয়াই বসিল!

মহিম সাগ্রহে তাহাকে কাছে টানিয়া লইতে চাহিলে প্রিয় আসিল না—কহিল এই ভাল।—

মহিম ভাবিতেছিল কি দিয়া কথা আরম্ভ করা যায় "গীত গোবিন্দ" আওড়াইবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে—প্রিয়বালা তখন আগেই কহিয়া বসিল। দেখ তোমার কিন্তু আর একটা বিবাহ কর্লেই ভাল হয়।

মহিম সবিস্ময়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিল কেন? তুমি কি আমায় ভালবাস না নাকি? না আমারও ভালবাসাতে ভাঁটা পড়ে গেছে।

প্রিয় কহিল না তা কেন?—তোমার ভালবাসার তুলনা নাই। আমার তাই আপশোষ হয় নিজে যখন সর্ব্বদা রাগ অভিমান নিয়ে মরি তোমার কোন সাধ মেটাতে পারি না, এমন কি ভালবাসতে পর্য্যন্ত পারি না তখন—

মহিম উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রিয়বালার অধরে একটা চুম্বন দিয়া কহিল। বুঝেছি সোণার চাঁদ আমার—আমি কি তার জন্য কোনদিন কিছু বলেছি। বড়মানুষের ঘরে আদরের দুলালী হয়ে মানুষ হয়েছো কারো প্রভুত্ব যে সইতে পার্ব্বে না, সেত জানা কথা।

প্রিয়বালা অশ্রুনিরুদ্ধস্বরে স্বামির পা দুটায় গাঢ়ভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল সত্যি বলছি, আমার কিছু দুঃখ হবে না তুমি বিবাহ করো সুখী হও। লোকে স্ত্রী চায় কিসের জন্য? শুধু তার অভিমান সইতে? আর মান ভাঙ্গাতে? পায়ের দাসী যদি মাথায় চড়ে ব'সে থাকে, সেত ভাল হয় না!—ব'লছিলেও ত কলকাতায় কোথায় গরীবের ঘরে পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে,—

মহিম তাড়াতাড়ি দুইহাতে প্রিয়বালার মুখটা চাপিয়া—হাসিয়া কহিল তুমি পাগল হ'য়েছো প্রিয়? এমন কথা ত তোমার মুখে ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই।

প্রিয়বালা স্বাভাবিক স্বরে কহিল শোন নাই সত্য কিন্তু শোনো। আমি যে তোমায় ভালবাসতে পারি না এটা তুমিও বোঝো আর আমিও যে বুঝি না তা নয় তবু যে তুমি আমায় ভালবাসো সে তোমার দয়া, নইলে আমিত জানি আমি তোমার পা ছোঁবারও যোগ্য নই!

আপনাকে দীন্ পৃথিবীর ধূলা মাটির মত দীন করিয়া দিয়া একটা অশ্রু তরঙ্গের মাঝে আপনাকে নিঃশেষ বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়াবালা যেন তবু কতকটা পরিতৃপ্তি লভিয়া লইল! কিন্তু একবারে তৃপ্তি লভিতে পারিল না,—মহিমের দিকে চাহিয়া কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল হায় তাহার এমন স্বামি আর সে কেন মিছামিছি একটা রোষ অভিমান লইয়া আছে যেখানে তাহারই সাধা উচিত সেখানে দেবতাকে কেন সাধিতে হয়? কিসের গর্ব্বে তাহার এই অহঙ্কার?

স্বামির পায়ের নীচে মাথা লুটাইয়া নারা মনে করিল—অশ্রু অবরুদ্ধ স্বরে সে ক্ষমা চাহিয়া লইবে, বলিবে, ওগো দেবতা ক্ষমা করো। নিজগুণে ক্ষমা করো;—কত আমার ত্রুটি, কত আমার অপরাধ।

কিন্তু তাহার বলিবার সে অবসর কোথায়? সাগর যে আগে

হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া নদীবালার সমস্ত গ্লানিমাকে, সমস্ত বেদনা বোধকে আপনার বিরাট প্রবণতার মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া নিরুদ্দেশ রহস্য—তীর্থের দিকে উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল। একটা কথা বলিবারই কি অবসর দিল! পুলক ও অশ্রু তাহারাই এই মহিমায় রঙ্গমঞ্চের দুই পার্শ্ব হইতে যবনিকা টানিয়া ধরিল!—

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈকালের দিকে. মহিমারঞ্জন একখানা খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিল। এমন সময় স্ত্রী প্রিয়বালা তাহার কাছটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল! মহিম খবরের কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই ঈষৎ কটাক্ষের সহিত একবার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া লইল। কোন কথা কহিল না, ভাবিল স্ত্রীই কি দিয়া কথা আরম্ভ করে দেখা যাউক না?

প্রিয়বালা খানিক স্তব্ধ ভাবে স্বামির মুখের দিকে চাহিয়া তারপর পানের ডিবা হইতে একটা পান বাহির করিয়া নিতান্ত কাছে দাঁড়াইয়া কহিল!—হাঁগা বলি সে মেয়েটা কেমন? 'ক'লকাতায় যাকে দেখে এসেছিলে? গরীবের ঘরে মেয়ে ব'লছিলে না? দেখতে খুব সুন্দরীই হবে কি বলো?

মহিম হাসিয়া পানটা স্ত্রীর হাত হইতে তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া কহিল। তাতে কি হয়েছে প্রিয়বালা? যতই সুন্দরী হোক্ তোমার মত ত আর কেউ নয়। বলিয়া কটিটী জড়াইয়া কাছে টানিয়া কহিল—সে কথা আবার উঠ্‌লো কেন প্রিয়?

প্রিয়বালা অন্যমনস্ক ভাবে হাতের সোণার শাঁখাটা নাড়িতে নাড়িতে কহিল। আমি ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে যা' তার বিয়ে হ'তো তাহ'লে ভাল হ'তো—

মহিম কপালের উপর চোক তুলিয়া কহিল ইস্! সত্যি?—কেমন ক'রে জানলে? আমারও তার সঙ্গে বিয়ে কর্ব্বার বড্ড ইচ্ছে, কেবল ঘটকের অভাবেই হ'য়ে উঠছে না। তুমিই ঘটকালিটা করে ফেল না? প্রিয়বালা কহিল আমি কি তা পারি না মনে ক'রেছ! বাবাকে হয়ত না হয় ব'লতে পারবো না কিন্তু—বুড়ো নায়েবটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সব ঠিক ক'রে নিতে পারি।

মহিম কহিল বাঃ শুনেও সুখ। প্রিয়বালা যে প্রাণধরে তার স্বামিটীকে আর একজনার হাতে তুলে দিতে পারবে একথা শুনেও সুখ। যে স্বামির দণ্ডেকের অদর্শনে তার প্রলয় বেধে যায়, সেই স্বামি দিনে দিনে মাসে মাসে আর একজনার হ'য়ে যাচ্চে—প্রিয়বালা তাই নীরবে সহ্য কর্ব্বে! তোমার উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল প্রিয়বালা হাতে হাত দাও—সজোড়ে প্রিয়বালার হাতটী কাঁপাইয়া লইল।

প্রিয়বালা কহিল সত্যি ঠাট্টা নয় আমি যদি তাদের ঠিকানাটা জান্তাম তবে লিখে দিতাম এবার আমার স্বামি ক'লকাতায় গেলে তোমরা তারি সঙ্গে সে বিদ্যাধরীর বিয়ে দিয়ে দিও। ঠিক রাজজোটক হ'তো। লেখা পড়াও খুব জানে, না? তা জানবে। দোষের মধ্যে গরীব, তাতে কি আসে যায়?

মহিম ভাবিতে লাগিল স্ত্রীও তাহাকে এরকম নিষ্ঠুর রকম কথা কেন শুনাইতে লাগিল! সেত স্বপ্নেও মায়ালতাকে বরণ করিয়া লইবে বলিয়া চিন্তা করে নাই তবে বাড়ী আসিবার সময় ক্ষিতিশ একবার

কহিয়াছিল বটে, আবার স্ত্রীও তাহাকে একাধিকবার সেই কথা কেন শুনাইতে লাগিল!—

ভবিতব্যতার বিধান কি তাই? স্ত্রীর দিকে বিগলিত এক চাহনি চাহিয়া কহিল। দোহাই প্রিয়বালা তুমি আমায় আর যাই শোনাও, পরিহাসচ্ছলেও ও রকম নিষ্ঠুর রকম কথা শোনাতে এসো না! তুমিত জান না তুমি আমার কতখানি?—তুমি হয়ত ভাবো অন্যরূপ কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় মনে যে তুমি ভিন্ন আর কারও স্থান নাই। সত্যি বলছি, ওকথাতে আমি বড্ডই ব্যাথা পাই! বড্ডই ব্যাথা পাই! কথার ভিতর দিয়াই যেন তাহার ব্যাথাটী ফুটিয়া উঠিল।

প্রিয়বালাও স্বামীর হৃদয়টা অধিকার করিয়া হাসিয়া কহিল। না না ব'লবো না। তোমার যাতে কষ্ট হয় তেমন কথা ব'লবো না। তবে আমার মনে হয় যেন আমি তাও পারি, নিজে যে অভাব মেটাতে পারি না, আর একজনা এ'সে যদি তোমার সে অভাব মেটায় তবে সেটা দেখেও সুখ!

দূঃ বলিয়া একটা চুম্বন দিয়া মহিম প্রিয়বালাকে, বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল।

এই রকম করিয়া সাধা সাধিতে গলাগলিতে ছুটির দিন গুলা নিতান্ত বোঝা স্বরূপ হইয়া অতিবাহিত হয় নাই রম্য একটা কল্পনা চিত্র উভয়েরই চক্ষের উপর প্রসারিত হইয়া গিয়াছিল। আর উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। প্রিয়বালার হৃদয়ে যে টুকু ফাঁক ছিল মহিম তাহা পুরণ করিয়া লইতেছিল, মহিমের হৃদয়েও যে সামান্য ফাঁক টুকু ছিল প্রিয়বালা তাহা পুরণ করিয়া লইতেছিল। ইতি মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কাও কাহার ছিল না কিন্তু সে দিনে উপর্য্যুপরি কয়খানা পত্র আসিয়া সব গোলমাল বাধাইয়া দিল।

পত্রে শশাঙ্ক তাহার দেশ হইতে লিখিয়াছিল পিতা মাতা তাহার বিবাহের সব আয়োজন ঠিক করিয়াছেন পাত্রী আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই।

আজ বন্ধু রুক্মিণীকান্তও ঐরূপ লিখিল। সেও অক্ষমতা জানাইয়া ক্ষমা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছে. মহিম একবার ভাবিল দূর হউক সবাই অক্ষমতা জানাইয়া যদি সরিয়া পড়িতে পারে, তবে তাহারই বা এত কি দায়?—কিন্তু সে স্থির থাকিতেও পারিল না। সে যে অভাগিনী বিধবা মাতাকে আশা দিয়া আসিয়াছিল, অভাগিনী যে তাহার দিকে চাহিয়াই কন্যাটীকে বক্ষে লইয়া দিন গণিতেছে। এই ছুটিটার মধ্যে বিবাহ না দিলে অভাগিনীর জাতিটাও রক্ষা হইবে না!

সন্ধ্যা বেলায় প্রিয়বালার খোঁজ করিল, ভাবিল প্রিয়বালাকে সবটা বলিয়া কলিকাতা রওনা হইতে হইবে। উপরের ঘরে উঠিয়া দেখিল নারী একাগ্র ভাবে পূজা আরাধনায় রত হইয়াছে, মহিম ঘরে ঢুকিয়াই পিছাইয়া আসিল। নারী যে এ প্রকার পূজা অর্চ্চনায় রত হইয়াছে; তাহা মহিম একদিনও দেখে নাই। পূজারিণী নারীর মধ্যে যেন একটা নূতন সৌন্দর্য্য অনুভূত হইল। খানিক পরে প্রিয়বালা স্মিতমুখে বাহিরে আসিয়া কহিল, তুমি আমার পূজোটা দেখে ফেল্‌লে? আমি যে মাঘ মাসে দীক্ষা নিয়েছি, কি করবো ছেলে পিলে হ'লো না মা বাবা তাই দীক্ষা নিতে বল্লেন। তুমি ত নেবে না জান্তাম। আমি তাই একলাই নিলাম।

মহিম হাসিয়া কহিল বেশ ক'রেছো। আমার কিন্তু একটা ধারণা ছিল মেয়ে মানুষের স্বামি ছাড়া বুঝি আর কিছু ধ্যান ধারণা নাই। তা ঈশ্বরের নাম নেওয়া অবশ্যই ভাল। তোমার গুরু তোমায় কিসের

দীক্ষা দিলেন প্রিয়? প্রেম ভালবাসার দীক্ষা না? যে প্রেমে পাষাণ গলে যায় যে ভালবাসায় বিশ্বভূবন এক হয়। কেমন তাই নয় কি?

প্রিয়বালা যদিও প্রেম ভালবাসা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত ছিলনা, এবং গুরুর কাছেও তাহার কোন ব্যাখা শুনে নাই। তবু মহিমের মুখে কথাটী কেমন নূতন তর ঠেকিল। তাহারও বোধ হইল যেন দীক্ষার উদ্দেশ্য বুঝি তাহাই হৃদয়টাকে প্রেমেতে আর ভালবাসাতে ভরিয়ে নেওয়া—

স্বামির দিকে ঔৎসুক্য পূর্ণ এক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল হাঁ। কিন্তু তুমি কি করে এ সব জানলে? হাঁগা? আমি ত জান্তাম—তুমি খ্রীষ্টান মানুষ ধর্ম্মের ধারই ধার না। এসব কেমন ক'রে জানলে?

মহিমও সোৎসাহে বলিয়া উঠিল যেমন ক'রে তোমার জানা গেছে। হৃদয় দিয়ে! তুমি গুরুর কাছ হ'তে শুনে শিখেছ। আমি হৃদয় দিযে বুঝে গেছি!—দেখনা ঐ ভালবাসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই ত তোমার কাছে ছুটে এসেছি নইলে তোমার পূজার সময়েতে কে আসতো বলো? বলিয়া তাহার যাহা বক্তব্য বলিয়া গেল।

প্রিয়বালারও এতক্ষণে সমস্তটী পরিস্কার হইয়া গেল। বুঝিল স্বামি তাহার শুধু তাহাকেই খুঁজিতে আসে নাই। কলিকাতার সেই রাক্ষসী কাঙালিনীই তাহার দুঃখ নিবেদন করিয়া স্বামিকে গৃহে, অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এক মুহুর্ত্তেই তাহার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় শক্ত হইয়া উঠিল। "যাবে কেন" কথাটীও বলিতে পারিল না।

মহিম স্ত্রীর ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল। বল ত এখন কি উপায় করা যায়! আমি না গেলেও সে অভাগিনী মা'র জাতি রক্ষা হয় না।

প্রিয় গম্ভীর স্বরে কহিল। তোমার যা খুসী তুমি তাই ক'রবে

আমি তার কি জানি। আমি কে? আমাকে বা, ওসব কথা বলাই কেন বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

মহিম প্রিয়বালার অঞ্চলটী চাপিয়া কহিল। রাগ করো কেন প্রিয়বালা? তুমি আমার স্ত্রী। সৎকাজে তুমিই আমায় উৎসাহ দেবে। আমি তোমার অনুমতি চাই! বলো কি করা যায়।

প্রিয়র চক্ষে তখন ভবিষ্যতটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে ভাবিতে ছিল। ছুটির দিন কটাও থাকিবে না? স্ত্রী অপেক্ষা তাঁহার সেই বিধবার কষ্টই বড় হইল? মহিমের দিকে এক কোপ কটাক্ষ হানিয়া কহিল। যাও যেথায় অভিরুচী, তবে আমায় যেন কিছু শুনতে না হয় আর; আমি মরি বাঁচি সে খবরও যেন তুমি না নাও বলিয়া চলিয়া গেল।

মহিম বুঝিল স্ত্রী অভিমান করিয়াই চলিয়া গেল। তবু সে দমিল না। স্ত্রীর পিতার অর্থের খাতিরে ও দমিল না। মনে মনে কহিল।— পার্থিব সকল সম্পত্তির উপরে যদি মানবতা সহৃদয়তার স্থান হয়; তবে আমার সে সত্যের কাছে শুধু স্ত্রীকে কেন, সমস্ত বিশ্বের মানবকেই অবনত হইতে হইবে।

স্ত্রী প্রিয়বালা কিন্তু তখনও ঠিক দিতেছিল। স্বামি অবার তাহাকে সাধিতে আসিবে, অন্ততঃ তাহার পিতার অর্থের খাতিরেও একবার আসিবে। কিন্তু কোথায় মহিমারঞ্জন!—

সমস্ত রাত্রি প্রিয়বালা স্বামির শয্যাতেই কাটাইল—তবু মহিম একবার বলিল না, যে আমি যাইব না, মনরাখা গোচও একটা কথা বলিল না যে আমি যাইব না। ক্ষোভে দাহে তাহার মনটায় যেন কাঁটা ফুটিতে লাগিল। ভাবিল স্বামি সহসা এত বড় কি সম্পত্তি পাইলেন যে যাহার জন্য, প্রিয়বালাকেও তাঁহার গ্রাহ্য না করিলেও চলিতে

পারে? নারী জানিত না। কিন্তু সত্যই সে বড় সম্পত্তি একটি পাইয়াছিল—সেটি হচ্ছে হৃদয়। খুব বড় একটী হৃদয়; যার উদার উন্মুক্ত পটে, সমস্ত বিশ্বভূবন অনায়াসেই স্থান লইতে পারে।

যেখানে কোন বাধা নাই! কোন কৃত্রিমতা নাই! আছে শুধু ভালবাসা! আর ভালবাসা!—আর প্রেম। বিদায় কালে অনেকখানি বিস্ময় দৃষ্টিতেই প্রিয়বালা স্বামির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---

কলিকাতায় আসিয়া মহিম একবারেই করুণাময়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল আগেকার মত মায়ালতা, সেই হাতে জাঁতি লইয়া শুপারি কাটিতেছে, আর মা, করুণাময়ী তাহার দিকে চাহিয়া, একটা দারুণ দুশ্চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন। মহিমকে দেখিয়া করুণাময়ী যেন অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকের সাক্ষাৎ পাইলেন। কাছে আসিয়া ব্যগ্র ভাবে কহিলেন এ'লে বাবা ভাবছিলাম দুঃখিনীর দিকে চেয়ে তুমিও বুঝি ভুলে গেলে। কতজনা পত্র লিখ্‌বে ব'লেছিলে। কেউ ত চিঠি দিয়েও একটা খোঁজ নিলে না, এখন এই মেয়েটা গলায় গেঁথে কি ক'রবো ভেবে পাচ্চি না।

মহিম আশ্বাস দিল, এবং দুই একদিনের মধ্যে চরম সংবাদ শোনাইবে বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একদিন দুই দিন কাটিয়া গেল কোন রকম আশার সংবাদ সে জোগাড় করিতে পারিল না, খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল সেখান হইতেও কোন প্রত্যুত্তর আসিল

না; টাকা চাই নহিলে কেহই গরীবের মেয়েকে শ্রীচরণের দাসী করিয়া তাহাকে ধন্য করিবে না।

বন্ধু বান্ধব যে যেখানে ছিল সকলেই ঐ টাকার কথাই পাড়িল।

মহিম হতাশভাবে আসিয়া করুণাময়ীর দাওয়াটায় বসিয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণের বাতাস ক্লান্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিতেছিল। দুখিনীর ঘরে সামান্য একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। আর তাহারি মৃদু আলোকে মহিম ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য করুণাময়ীকে ডাকিয়া পাঠাইল কিন্তু তাহার ভরসা দিবার মত, একটা কথাও তখন সম্বল ছিল না।

মৃগাঙ্ক শশাঙ্ক রুক্মিণীকান্ত অবলাকান্ত প্রভৃতি নামগুলা একটা মরিচীকার দীপ্তিহানিয়া মরিচীকাতেই অন্তর্ধান করিয়াছিল। সে তাই ভাবিতেছিল করুণাময়ীকে কি বলিবে? একবার ভাবিতেছিল সেও না হয়, শেষ কথাটা বলিয়া, তারপর আস্তে আস্তে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু কথাটা কেমন করিয়া পাড়িবে সেইটেই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

গৃহস্থালীর কাজ সারিয়া করুণাময়ী আসিয়া, কাছে বসিলে মহিম মাথা চুলকাইয়া কহিল। হ'লো না মা দেখলাম টাকারই বশ এ সংসার বিনাপণে কেউ এগুতে চায় না।

করুণাময়ী ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন দেখলে ত? তখন বড় গলায় ব'লেছিলে না যে নিশ্চয় রাজী করাতে পারবো। এখন দেখলে ত?

মহিম কহিল। দেখলাম! দুনিয়াটা, যে এমন টাকাতেই চলে, এ ধারণাটা আগে আমার ছিল না, ভাবতাম মনুষ্যত্ব নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু যতই ঘুরছি ততই সংসারের ভাব দেখে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি।

অনেক খ্যাতনামা দেশভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু সবাইকারই মুখে এক উত্তর। টাকা চাই। অথচ তাঁরাই সভাক্ষেত্রে, বড় গলায় বলেছেন বিবাহে টাকা লেন দেন ঘোর তামসিকতা আবার কেউ কেউ বল্লেন, হিন্দু কন্যারা ত বাপের বিষয়ের ভাগ পায় না, ঐ বিবাহের সময় যে বরপণটা আছে সেটাও উঠ্‌লে চ'লবে কেন?—আমিও তাই আর কোথাও যেতে সাহস কর্‌লাম না।

করুণাময়ী কহিলেন, তুমি ত আর সাহস ক'রলে না, কিন্তু আমি মেয়ে মানুষ একটা পয়সা হাতে নাই, কি নিয়ে সাহস করি বল দেখি। মেয়েটাকে নিয়ে শেষকালে কি গঙ্গার জলে ঝাঁপ খেয়ে মর্‌বো বলো বাবা! দুঃখ জানিয়ে তোমাকে অনেক হাঁটিয়েছি, অনেক কষ্ট দিয়েছি, শেষে কি কর্ব্বো এই কথাটা—আমায় জানিয়ে দিয়ে চলে যাও। ব'লে দাও—কেবল আমি কি ক'রবো?

মহিম চিন্তিতভাবে অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল। দেখ্‌লেন ত আমি প্রাণপণ চেষ্টার ক্রটি করি নাই।

করুণাময়ী অশ্রু অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—"চেষ্টার ক্রটি করো নাই সে ত জানি বাবা! কিন্তু তুমি ছাড়া ত আমার আর উপায়ও নাই। কে এ দুখিনীর দিকে চাইবে, এত বড় হৃদয় আর কার আছে? বলিয়া, নিতান্ত নিরুপায় ভাবে পরম একটা করুণাশায় মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বানে ভাসিতে ভাসিতে যে তরীখানা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহার মনে হইতেছিল ইহাই তাঁহার পরম অবলম্বন। এ তরী ছাড়িয়া দিলে আর তাঁহার পারের উপায় নাই। কিন্তু এ তরীখানাও যে বানচা'ল মারিয়া গিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

মহিম ও ক্ষুণ্ণ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। সেও ভাবিতে

লাগিল—এত চেষ্টা, এত উদ্যম, তাহার সব ব্যর্থ হইয়া গেল। কিছুই করিতে পারিল না।—

সহসা করুণাময়ী প্রবল একটা আগ্রহে মহিমের হাত দুটী জড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন। কেউ যখন না রাজি হ'লো তখন তুমিও কি পারবে না? এ গরীবের জাত রক্ষা ক'রতে? এমন ত বেশী কিছু নয়, শুধু মেয়ের কুমারী নামটী ঘুচিয়ে দিয়ে আমার জাতিটা রক্ষা ক'রে চলে যাবে। পারবে না।—হাঁ বাবা!—

নৈরাশ্যের দুঃসাহসে আর তাঁহাকে কিছুই বাধিল না।—

চরম মুহূর্ত্তে যখন আর কোন অবলম্বন নাই সেই সময়কার জন্য যে কথা কয়টি তাঁহার অন্তরের নিভৃততমপ্রদেশে, পুঞ্জীভূত ছিল, সেই কথাকয়টী নিঃশেষে বাহির করিয়া দিয়া, একবারেই মহিমের কাছে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। এখন মহিমের ইচ্ছা—সে করুণা করিতেও পারে, নাও পারে।

পথে চলিতে চলিতে সহসা সম্মুখে গভীর গহ্বর দেখিলে পথিক যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, মহিম কথাটা শুনিয়া প্রথমটা তেমনি শিহরিয়া উঠিল। এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রী প্রিয় বালাকে মনে পড়িয়া, তাহার সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি এক সঙ্গে "না না" বলিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরেও প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া আপনার অসম্মতি জানাইতে পারিল না। শুধু কহিল সে কি করে হবে মা আমার যে বিবাহ হ'য়ে গেছে।

করুণাময়ী তখনও মহিমের হাত দুটী চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কহিলেন,—"আমার মেয়ে ত তার সতীনের ঘর ক'রতে যাবে না।" শুধ্ নাম মাত্র বিয়ে, জাত রক্ষার মত বিবাহের একটা অনুষ্ঠান মাত্র। তার পর তুমি যার—তুমি তারই—থাকবে। আর আমার মেয়ে আমায় সঙ্গে দুঃখের ধান্ধাতেই দিন কাটাবে।—

করুণাময়ীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে কথাটী শুনিতে অসংলগ্ন লাগিল না বটে, কিন্তু তাহাই কি ঠিক? একটা কুমারী জীবনকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া, তারপর তাহাকে, চিরজন্মের মত ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তে অন্য স্ত্রীর সহিত সংসারধর্ম্ম করা—বিশ্বপতির নিয়মে এতটা কি সহিবে?—বিবাহ সেত শুধু জাতিরক্ষা মাত্র নয়, তার সঙ্গে যে চিরজীবনের একটা কর্ত্তব্য জড়িত রহিয়াছে, পবিত্র যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখে ইহকাল পরকালের সহচরী করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, শেষকালে পরিত্যক্ত পাদুকাখণ্ডের মত ত্যাগ করিয়া আসা,—সয়তানেও যে সেরূপ নিষ্ঠুরতাকে শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে ঘৃণা বোধ করে। আর—মহিম মানুষ হইয়া তাহাই করিবে?—

একটা ব্যকুল চাহনি হানিয়া মহিম করুণাময়ীরদিকে চাহিয়া রহিল। অথচ ফুটিযাও কিছু বলিতে পারিল না। কারণ করুণাময়ীরও আর কোন আশা অবলম্বন ছিল না।—

করুণাময়ী কহিলেন,—"না বাবা! তোমার এতে অমত কল্লে চল্‌বে না। এতে অধর্ম্ম নাই। দুখিনীর জাতিটা রক্ষা ক'রতে তুমি ছাড়া আর কে আছে বল?"

মহিম কহিল,—তবে তিনটি দিনমাত্র আমায় ভাববার সময় দিন তারপর কোথাও না পাত্র জুটে, আমিই আছি!—

কথাটা বলিল বটে, কিন্তু আপনার বাসায় আসিয়া স্ত্রীর পত্রখানা খুলিয়া বুঝিতে পারিল। কি অসমসাহসিকতার কর্ম্মই সে করিয়াছে, একবার ভাবিল করুণাময়ীকে, কোন কথাই না বলিয়া আস্তে আস্তে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। আবার তখনই ভাবিল, এ দুর্ব্বলতা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল!—

আবেগ কম্পিত-হৃদয়ে স্ত্রীকে লিখিল। আমি জীবন মরণের

সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছি। সেই দুঃখিনীর কন্যা আমার জীবনের রহস্যময়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এতবড় সমস্যার সম্মুখে কিন্তু কখনও দাঁড়াইতে হইবে, এ কথা আমি স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। কি করিব। তাহারও স্থির নিশ্চয়—এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে এটা সত্য যদিই কোন পাত্র না পাই তবে আমাকেই সে বিষ গলাধঃ করিয়া লইতে হইবে! ভাবিও না, তোমার পরে, কোনরূপ অভিমান করিয়া এ কার্য্য করিতে যাইতেছি। দেখিতেছি এ নিয়তি এ ভবিতব্য; আমার ইহাতে কোন হাত নাই। আরও অনেকখানি লিখিয়া চিঠিখানা খামে মুড়িয়া ডাকে ফেলিয়া দিয়া আসিল!—

তারপর ভাবিতে বসিল!—

ভবিষ্যতের দিক চাহিয়া দেখিল। যদি বিবাহই করিতে হয়—এবং স্ত্রী প্রিয়বালা যদি এ বিবাহটীকে ভাল ভাবেই গ্রাহ্য না করে—তবে তাহার পিতার বিষয় প্রাপ্তি সম্বন্ধেও একটা ঘোর সন্দেহ রহিয়া যায়। অথচ গরীবের কন্যাকে, না উদ্ধার করিলেও নয়।—মহিম ভিতরে একটু ক্ষুণ্ণও হইতে লাগিল!—কি অশুভ লগ্নেই সে দিন সে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এবং কি অশুভক্ষণেই সে দরিদ্রার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সকল চিন্তার উপরে তাহার মনের মানুষটি পরম নির্ব্বিকার ভাবেই বলিতেছিল।—

মরিতে হয়—মানুষ,—মানুষ হইয়াই মরো। পথে চলিতে হয় দুর্গমের যাত্রী হইয়াই চলো!—বরণ করিতে হয়—সত্য সুন্দরকেই বরণ করো!—আবার জয়ী হইতে হয় যুদ্ধ করিয়াই জয়ী হও! মহিম স্থির করিল। সে জয়ী হউক না হউক যুদ্ধই করিবে। এবং যুদ্ধ করিয়াই মরিবে!

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এ কয়টা দিন কেবল আপনার সহিত আপনি দ্বন্দ্ব তর্ক বিতর্ক করিয়া, মহিম বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য ঘরে আর মন টিকিতেছিল না বন্ধু বান্ধবদের ব্যবহার দেখিয়া, বন্ধু বান্ধবদেরও সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল!—

শূন্য গৃহে শুধু মনটা লইয়া আর পোষাইতেছিল না। তাহার উপরে গৃহের বদ্ধ বাতাসটাও ক্লিষ্ট চিত্তটীর উপরে পাষাণ ভারের মত চাপিয়া বসিয়া যাইতেছিল!—

বাড়ী হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্তির আশা না করিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষেই মহিম বাসার বাহির হইয়া পড়িল। খানিক এধার ওধার ঘুরিয়া করুণাময়ীর দ্বারের কাছেই আসিয়া দাঁড়াইল। সে স্থির করিয়াই আসিয়াছিল হেস্তনেস্ত যা হয় একটা কিছু হইয়া যাউক। এমন ধারা আশঙ্কা ও উদ্বেগ লইয়া ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে, ভাবিয়া আরত চলে না।

করুণাময়ী প্রথমে মহিমের স্বাস্থ্যের খবর লইয়া তার পর সস্নেহে কহিলেন তা হলে সব ঠিক কর্লে ত বাবা?

মহিম কহিল। ঠিক না ক'রে আর কি করি বলুন? যখন কথা দিয়েছি তখন সত্য রক্ষা ত করিতে হইবে?

করুণাময়ী কহিলেন,—"তবে আজই গায়ে হলুদটা হ'য়ে যাক্ না?"

মহিম কহিল আপত্তিই বা কি আছে? এতো জাঁকজমকের বিয়ে নয়। জাত রক্ষার বিয়ে।—

করুণাময়ী অশ্রু-ছলছলনেত্রে কহিলেন, সেটা সত্য বাবা, তাহ'লে পড়শীদের খবর দিই গে ?—

মহিম কহিল, যান !—

করুণাময়ী কহিলেন,—"দেখ বাবা ! বাড়ীতে পত্র টত্র ত দাও নাই। আবার বাড়ী হতে লোক এসে বারণ করতেও পারে।

মহিম কহিল, সে জন্য চিন্তা নাই।

করুণাময়ীর হৃদয়ে আজ যত দুঃখ, ততই বেদনা বোধ হইতে লাগিল। একটী মাত্র কন্যা, যে কন্যার বিবাহে করুণাময়ী কত সাধ আহ্লাদ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই কন্যার বিবাহটা কেবল একটা নিয়ম রক্ষার মত ভান করিয়া চুপি চুপি সারিয়া লইতে হইল ? তবু বুক বাঁধিয়া আয়োজন করিতেও লাগিয়া গেলেন। সাহস করিয়া চক্ষের জলও ফেলিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, কি জানি চক্ষের জলে যদি, এ মহিমারঞ্জন পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়।—

পুঁজিপাটা বাহির করিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন। পড়শীর বিন্দুর মা, আগে হইতে বাজার করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিল বিয়ের দিনে সে আসিতে ইতস্ততঃ করিল না।—

মহিম তখনও ভাবিতেছিল যদি কেহ আসিয়া তাহাকে এ বিবাহের দায় হইতে নিষ্কৃতি দেয়, এমন কোন বীর পুরুষ নাই কি ? শুদ্ধ মাত্র এই দায়টা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিয়া তাহাকে হাঁপ ফেলিবার অবসর দেয়—মহিম তাহার গোলাম হইতেও রাজি আছে। কিন্তু নাই, তেমন বীর পুরুষ কোথাও নহে। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া প্রেত পিশাচগুলা অর্থ অর্থ করিয়া তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে। স্নেহ প্রেম তাহাদের স্পর্শও করিতেছে না। সমস্ত বিশ্বের করুণা তাহাদের পদনিম্নে পড়িয়া নির্ম্মমভাবে দলিত হইয়া যাইতেছে।

মহিম তখন একবার বধূজীবন প্রার্থিনী মায়ালতার দিকে চাহিয়া লইল।

মায়া তখন ছোবান একখানি কাপড় পরিয়া কপালে চন্দনের টিপ কাটিয়া একখানা কাজললতা হস্তে মায়ের "ফাই-ফরমাস" খাটিতে-ছিল। যদিও সে দোজপক্ষের বরে সমর্পিত হইতেছিল। তবুও তাহার সমস্ত ম্লানিমার উপরে একটা পরিপূর্ণ নারী শ্রী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মূকমহিমা যেন নীরবেই প্রকাশ করিতেছিল; নিয়তি তাহাকে যে পথেই চালিত করুক তাহার মধ্যেও সেই বিশ্বের সত্যকার নারীপ্রকৃতি আছে, যে সেবা করিতে পারে,—পূজা করিতে পারে, আবার মা হইয়া জগতটাকে বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে।

মহিমের অনেক দিন পূর্ব্বেকার প্রিয়বালাকে মনে পড়িল!

সেও নব অনুরাগের প্রথম উন্মেষ প্রভাতে এম্নি উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল! তাহারও অধরে এম্নি ব্রীড়া ছিল সঙ্কোচ ছিল! আবার স্বামিটীর পানে একটা গোপন আগ্রহভরা দৃষ্টি ছিল! কিন্তু আজ কোথায় প্রিয়বালা, সে হয়ত এতক্ষণ তাহার পূজার মন্দিরে এই স্বামির জন্যই দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেছে। আর স্বামি তাহার?—

একটা উদ্বেল অশ্রু-প্রবাহ মহিমের বক্ষ প্লাবিত করিয়া বহিয়া গেল!—কিন্তু তবু তাহার কোন উপায় ছিল না। তাহাকে ধর্ম্ম রক্ষা করিতেই হইবে। জাতি রক্ষা করিতেই হইবে!—

সহসা মহিমের দিকে নজর পড়িতে মায়ালতা সরিয়া গেল। বোধ করি তাহার বালিকা বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, লজ্জাটীও একটু বেশী ছিল। মহিম যতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল ততক্ষণ সে সাহস করিয়া বাহিরে আসিতেও পারিল না।

মায়ালতাকে দেখিয়া মহিমের বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল!—

হায়! নারী অন্ধও নয়, পঙ্গুও নয়, তবু তাহাকে একবার দায়ে পড়িয়া একজনা কার পায়ের কাছে বিকাতেই হইবে। তাহার একটা ভালবাসা-বাসিরও আশা নাই। কিম্বা প্রেমের একটা দান প্রতিদানেরও কল্পনা করিবার কিছু নাই।—

তবু তাহাকে একবার তাহার হৃদয় ভরা সাধ আশাগুলি লইয়া এক সঙ্গ বিমুখ পুরুষের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারের কাছে, তাহার যথা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। প্রারম্ভের পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজাইয়া রিক্ত হইয়া ঘরে ফিরিতে হইবে। যে জীবনের প্রারম্ভে নারী, পুরুষ, পরস্পরের চক্ষে অপরূপ হইয়া দেখা দেয় সে জীবন একটা মরিচীকার দীপ্তি হানিয়া মরুতেই মিশাইয়া যাইবে। বুকে বাজিবে শুধু একটা, তপ্ত হাহাকার!—প্রারম্ভেই হিসাব নিকাশ চুকাইয়া যেমন দুঃখ ও দৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ছুটিয়াছে, তেমনি ছুটিতে হইবে। ক্লান্ত হৃদয়ের পরে কেহ একটা সোহাগের অমৃত স্পর্শও রাখিয়া যাইবে না।

মহিমের সমস্ত হৃদয় যেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। না এ বিবাহ শ্রেয়ো নয়! শ্রেয়ো নয়।—

কিন্তু খানিক ভাবিয়া দেখিল,—এ বিবাহ ব্যতীত সমাজে তাহার মুক্তিও নাই। বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা হৃদয়ের মিলন হউক আর নাই হউক। সমাজকে দেখাইতে হইবে যে, সে বিবাহিতা। টাকার অভাবে চিরকুমারী থাকিয়া উর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষকে নরকস্থ করে নাই!

তখন মহিমের মনে পড়িল যে কোন সমাজের মধ্যে আসিয়া জন্মিয়াছে, এ যে সেই সমাজ যে সমাজ নির্ব্বিচারে দণ্ড-বিভাগ করিয়া দেয় কিন্তু প্রতিকারের কোন পথই বলিয়া দেয় না!—

মহিম বর বেশেই সান্ধ্য সমিতিতে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যে এতশীঘ্র সেখানে যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল তাহা নহে, অসহ্য একটা দাহর তীব্র উন্মাদনায় পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দুনিয়াটাকে আজ দুকথা বলিয়া না লইলে যেন তাহার কিছুতে সোয়াস্তি হইতেছিল না!—বলিবে, আজ সে বলিবে,—এমন কিছু বলিবে, যাহার মধ্যে জ্বালা আছে, হাহাকার আছে। নিশ্চেষ্ট কুম্ভকর্ণের কর্ণের কাছে যেন সেটা সাগরের উন্মাদ গর্জ্জনের মত বিপুল এক প্রাণানন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়া বিরাট একটা চেতনার বাণী মন্ত্রিত করিতে পারে।

ভগবান বল দাও, আজ তার বাণী সত্য হউক, সত্য হউক!!

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

---

ক্লব গৃহে তখন বলিদানের রিহার্শেল চলিতেছিল, সভ্যগণের কেহ অর্দ্ধ শায়িত হইয়া কেহ পূর্ণ শায়িত হইয়া চুরুট ও বার্ডসাই ফুঁকিতেছিল। কেহ বা তদ্গতচিত্তে রিহার্শেল মাষ্টারের শিক্ষানুযায়ী সানুনাসিক কৃত্রিম বক্তৃতার ভূমিকা শিখিতেছিল।

শশাঙ্কই ছিল দলের চাঁই, কি করিয়া হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ীর মাতা উৎপীড়িতা কন্যার বিয়োগে, পুকুর ঘাটে বসিয়া ডাকাডাকি করিয়া কাঁদিয়াছিল, সেইটিই ভাবযুক্ত ভাষায় এক বালককে শিক্ষা দিতেছিল।

এমন সময় বাহির হইতে মহিম ডাকিল, শশাঙ্ক! শশাঙ্ক যে দেশ

হইতে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, এখবরটা মহিম রাখিত, তাই গম্ভীর গর্জ্জনেই ডাকিল,—শশাঙ্ক!—

সহসা অসম্ভাবিতপ্রকার গভীর আহ্বানে সকলেই চকিত হইয়া উঠিল। এবং রসভঙ্গ হেতু সকলেই মহিমের দিকে বক্রভাবে চাহিয়া রহিল। মহিম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিল,—শশাঙ্ক, এই যে মিথ্যা করে কেঁদে যে অভিজ্ঞতাটুকু অর্জ্জন কচ্চো একবার মানুষের জন্য সত্য করে কাঁদলে তার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রতে না কি?

শশাঙ্ক, মহিমকে একটা চেয়ার সরাইয়া দিয়া কহিল,—বলি ব্যাপারটাই কি বলোনা শুনি।

মহিম চেয়ারে না বসিয়া কহিল,—"কি ব্যাপার মনে নাই? ছুটির আগে যখন দেশে যাও, তখন কি ব'লে গিয়েছিলে? বলেছিলে নয় যদি বিবাহ করিতে হয় তবে গরীবের মেয়েকেই করবো? তারজন্য আমার কাছে প্রতিশ্রুতও হয়েছিলে কিন্তু একমাস যেতে না যেতে সে প্রতিজ্ঞাটী দিব্যি ভূলে যেতে পারলে।

শশাঙ্ক কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অন্য একজন চশমাধারী কহিলেন, তার কি বল্‌ছেন মশাই, যেখানে টাকা পাবে সেই থানেই বিবাহ করবে? না আপনার মত একটা খেয়ালে ভর ক'রে বাপ মার মনে কষ্ট দিয়ে কোন এক গরীবের মেয়েকে বিনাপনে বিয়ে কর্‌তে যাবে, সংসারে টাকাটাই বড় জিনিস জান্‌লেন!

মহিম ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতেছিল কিন্তু দুকথা না বলিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিল না, কহিল,—টাকা উত্তম জিনিস সে কথা অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নাই। কিন্তু কেন তবে এই শিক্ষিত নাম নেওয়া? কেনই বা সহরের গলিতে গলিতে প্লাকার্ড মেরে বিজ্ঞাপন দেওয়া—

এই সমিতির অভিনয়ের অধিকাংশ আয় দরিদ্র কন্যাদায়-গ্রস্থের সাহার্য্যের জন্য বিতরণ করা হইবে। টাকাই যখন বড় তখন শুধু টাকার কথাটাই লিখলেত পার্ত্তেন; কেন ভান করেও টাকার উপরে "সহৃদয়তা মানবতার" স্থান নির্দ্দেশ ক'রেছেন? বলুন কিসের জন্য?—

কণ্ঠস্বরে সমস্ত ঘরটা যেন গম্‌গম করিয়া উঠিল। চশমাধারী দেখিলেন লোকটা ত তাহা হইলে তাঁহাকে খাটো ও খেলো করিয়া দিয়া যায়, গোঁপজোড়াটায় একটু চাড়া লাগাইয়া কহিলেন, বেশ মশাই আপনার কথামতই না হয় মানা গেল—পরার্থপরতার কাছে স্বার্থপরতাটাকে বলি দিতে হয়—আমাদের গরীবের মেয়েকে বিয়ে করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু উত্তর দিন কোন্ আইনে কন্যা-সন্তান পুত্র-সন্তানের মত পিতার বিষয়ের অধিকারে—বঞ্চিত হয়! সে বুঝি বাপের ছেলে নয়? এই যে বরপণ—বরপণ করে চারিদিকে সোর-গোল উঠেছে;—কিছুই হবে না, যতদিন না কন্যা—পুত্রের মত পিতার বিষয়ের-একটা অংশ পায় বুঝলেন?—

মহিম চীৎকার করিয়া কহিল আমিত সে কথা নিয়ে মশাইদের সঙ্গে তর্ক ক'রতে আসি নাই, আমি এসেছিলাম শুধু, আমার বন্ধু এক কপর্দ্দকহীনা, অভাগিনীর কন্যারত্নকে বিবাহ ক'রে উদ্ধার ক'রবো বলে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন বলেই!—আমি তাকে সেই কথাটি মনে পাড়িয়ে দিতে এসেছিলাম।

চশমাধারী হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—আর সে মনে পড়ানও ত মিথ্যে যখন শুভকার্য্যটা আগেই সমাধা হইয়া গিয়াছে।

মহিম বজ্রনাদে কহিল,—তবু আজ সহস্রকণ্ঠেই ব'লবো তার গভীর অন্যায় করা হয়েছে, দেশের শিক্ষিত সন্তান সে যদি, সত্য

আদর্শ ভ্রষ্ট হ'য়ে—গড্ডালিকা স্রোতেই আত্ম বিসর্জ্জন করে—তবে অপর সাধারণের দোষ ত মার্জ্জনীয়!

শশাঙ্ক আম্‌তা আম্‌তা করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল,—বিবাহ না ক'রে থাকি, না হয় তার জন্য দণ্ড ধরে নাও এবারকার অভিনয়ের সমস্ত টাকা না হয় কপর্দ্দকহীনা কন্যাদায়-গ্রস্থাকে দিয়ে দেব। কিন্তু যা হ'য়ে গেছে তার ত চারা নাই!

মহিম কহিল,—দেখ শশাঙ্ক, সংসার কেবল তোমাদের মত বাক্য-বাগীশদের মুখ চেয়েই চলে না, কবে অভিনয় ক'র্ব্বে, টাকা দেবে তবে সে মেয়ের বিবাহ হবে, এসব ভেবে চ'ললে যারা কথা অনুযায়ী কাজ করে তাদের চলা হয় না। জেনে রেখো শশাঙ্ক, সৌখীন রকম দেশ প্রেমিকতায় নাম কেনা হয় সত্য!—কিন্তু তাতে কাজ চলে না। কাজ ক'রতে হ'লে ত্যাগ চাই, সত্যকে প্রাণের মধ্যে অনুভব করা চাই। বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

চশমাধারী কহিলেন,—লোকটা কি বাঙ্গাল নাকি হে, বেশ গোঁ রয়েছে ত দেখা যায়!

শশাঙ্ক কহিল,—নাহে বাঙ্গাল হোক যাই হোক কিন্তু মনুষ্যত্ব আছে, কথা রক্ষা ক'রতে, হয়ত নিজের স্ত্রী সত্ত্বেও গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেলবে। তার মধ্যে এমন একটা জোড় আছে, তেজস্বিতা আছে যা সহসা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

এমন সময়ে মৃগাঙ্ক আসিয়া কহিল কার হে? মহিমের নাকি!

শশাঙ্ক কহিল। হাঁ।

মৃগাঙ্ক কহিল ওযে আজ, নিজেই বিধবার কন্যাটীকে বিবাহ করতে যাচ্চে। আমি বরযাত্র যাবো কিনা ব'লে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম কটমট্ ক'রে চেয়ে চলে গেল কোন উত্তরই দিল না, কিন্তু, আমি আমা-

দের ঝির মুখে শুনেছি, আজই সে গরীবের কন্যাটীকে উদ্ধার ক'রে ফেলবে।

শশাঙ্ক সস্মিত মুখে, চশমাধারীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল শুন্‌লে ?—যা ভেবেছিলাম তাই !—ওকেও মস্ত একটা বীর ব'লতে পারা যায়। কথায় সুরেই মহিমের'পরে শশাঙ্কের শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিল।

চশমাধারী আড় হইয়া পড়িয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন এবং অভিনয় কার্য্যটী যেমন শৃঙ্খলায় চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চিঠিখানা পড়িয়া প্রিয়বালা যেন একবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। এই চিঠি কি তাহার স্বামির হাতে লেখা ?—যতই ভাবে এ চিঠি তাহার স্বামির হাতের নয়, ততই চিঠি খানা যেন সত্য হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসে। কিছুতেই ভাবিতে পারে না যে কোন দুষমনেই এ চিঠি লিখিয়া বাদ সাধিয়াছে, আর স্বামির মনটাও সে জানিত।

তাহার চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু অধিকক্ষণ কাঁদিতেও পারিল না। কেমন একটা অসহ্য দাহে তাহার সমস্ত অশ্রু শুকাইয়া আসিতেছিল !—

শাশুড়ী ক্ষেমঙ্করীকে ডাকিয়া চিঠিখানা দেখাইয়া কহিল। দেখ দেখি মা, এ চিঠি কি তারই লেখা ?

ক্ষেমঙ্করী, ঘড়মানুষের মেয়ে বলিয়া এবং তাহার বাপের বিষয়টাও পুত্রের পাইবার আশা আছে বলিয়া, প্রিয়বালাকে সাধারণ শাশুড়ীদের

দৃষ্টি হইতে একটু বেশী মাত্রায় স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতেন। তাই এ প্রকার চিঠি দেখিয়া, তিনিও যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন। কহিলেন, বল কি বউ? মহিম আবার বিয়ে ক'রতে পারবে? আমি কর্ত্তাকে ব'লে এখুনি লোক পাঠাই।

প্রিয়বালা কহিল,—আর লোক পাঠিয়ে কি হবে মা? সে যখন আমায় চিঠি লিখেছে, তখন বিয়ে ক'রবে তাতে ভুল নাই। বাড়ী এসে আমাকেও একবার সে কথা ব'লেছিল যেন—কিন্তু আমি তখন কথাটী গ্রাহ্য করিনি। বলেছিল এক অনাথিনীর কন্যা আছে, টাকার অভাবে পাত্র জুট্‌ছে না, কিন্তু সে নিজে সে ভার নিয়েছে। বোধ হয় কেউ রাজী হয নাই ব'লেই রাজী হয়েছে।

ক্ষেমঙ্করী বৌয়ের দিকে টান টানিয়া, চোকদুটী কপালের উপর তুলিয়া কহিলেন। গরীব হোক আর যাই হোক। তা ব'লে বিয়ে-টাই কি ওম্‌নি ক'রলেই হ'লো? সেত কিছুতে হ'তে পাবে না বাছা, আমি কর্ত্তাকে, ব'লে এখুনি লোক পাঠাই। কবে বিয়ের দিন তা কিছু লিখেছে?

প্রিয়বালা চিঠির তারিখটা দেখিয়া কহিল,—যদি চিঠি সত্য হয় তা হ'লে বিয়ে মা, হবার মা তা হয়েই গেছে, আর যদি মিথ্যে হয় তা হ'লে আজও হয় নাই।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন,—তা যাই হোক বাছা আমি লোক পাঠাবই বলিয়া কর্ত্তার কাছে নথ নাড়িতে নাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত খবরটা আনুপূর্ব্বিক যথারঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া লোক পাঠাইবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কর্ত্তাকেও বিন্দুমাত্র দ্বৈধমত করিতে দিলেন না। কর্ত্তা যোগনাথও বধূ প্রিয়বালার বাপের বিষয়টাকে খুব সম্মানের চক্ষেই নিরীক্ষণ করিতেন। এবং সেটা হাতে আসিলে

তাঁহার অস্বচ্ছল সংসারে অনেকটা যে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন এটাও ঠিক দিয়া ভাবিয়া দেখিতেন।

এই কারণে তিনিও লোক পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিলেন না!—তাঁহার ইহাও একটা প্রধান ভাবনার বিষয় হইল মহিমের—শ্বশুর শিখরেশ্বর বাবু যদি, মহিমের এ বিবাহ করিবার সংকল্পটা পর্য্যন্ত শুনিয়া ফেলেন তাহা হইলে তাহার আইন পড়িবার খরচটাও হয়ত না দিতে পারেন!—বিশ্বস্ত ভৃত্য সাধুচরণকে এক লম্বা চওড়া পত্র দিয়া এবং মৌখিকও যথারীতি উপদেশ দিয়া সেই দিনই তাহাকে বাড়ী হইতে রওনা হইবার জন্য আজ্ঞা দিয়া দিলেন।

সাধুও যোগ্য ব্যক্তি ছিল। কহিল,—কেমন করে মহিমকে বোঝাতে হয় সে তত্ত্ব আমি জানি,-সে যতই লেখা পড়া শিখুক আমাদের কথা ঠেলতে পারবে না। যদি নান্দীমুখও হ'য়ে থাকে, তা হ'লে বিয়ে ক'রতে পারবে না।

যোগনাথের শরীর অসুস্থ ছিল। নহিলে তাঁহারও ইচ্ছা ছিল তিনি শুদ্ধ সঙ্গে যান। বাড়ীর সকলেরই অসম্ভব রকম চাঞ্চল্য দেখা গেল!—প্রিয়বালারও বুঝিতে বাকী রহিল না এতটা চাঞ্চল্য জন্মিবার হেতু কি?

যাইবার আগে, প্রিয়বালা, সাধুকে একবার ডাকাইয়া, চুপি চুপি কহিয়া দিল। দেখ যদি বিবাহ, হয়েই গিয়ে থাকে, তবে তার ত কোন—উপায় নাই, তাই বলে তাঁকে নতুন বৌ নিয়ে ঘরে আসতে ব'লো। কি তুমিই শুদ্ধ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। আমি বুঝছি, যদি বিবাহ হ'য়েই থাকে, তবে তাকে তা—দায়ে প'ড়েই ক'রতে হ'য়েছে। ভয় ক'রতে বারণ করো। আমার নাম ক'রে বলো লোকে সতীন নিয়েও ঘর ক'রে থাকে, একটা কাজ করে ফেলেছে ব'লে বাড়ীর সম্পর্ক না বিসর্জ্জন দেয়।

প্রিয়বালার তখন সেই আশঙ্কাটাই প্রবল হইতেছিল।—যদি স্বামি তাহার গঞ্জনার ভয়ে—আর এ মুক্তাগাছায় পদার্পণ না করে। যদি এ অভাগিনী প্রিয়বালাকেও দর্শন না দেয়, তাই সে সাধুকে ডাকিয়া, তাহার যাহা, বলিবার তাহা বলিয়া দিল।

সাধুও যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কেমন যে প্রিয়-বালার—মনটী, আশঙ্কাটা তাহায় কিছুতে যাইতে চাহেনা, ভাবে; যদিই বিবাহ করিয়া নূতন স্ত্রী লইয়া ঘর কন্না করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় কি হইবে। আবার পত্রখানা পড়িয়া দেখে, না দায়ে পড়িয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে হইতেছে, নহিলে প্রিয়বালাকে, সে কি একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে? আর যেমন তেমন প্রিয়বালা নয়, যে প্রিয়বালাকে বিবাহ করিয়া, সে এখনও পড়িতে পাইতেছে। তাহার স্থির বিশ্বাস হইল। ইহাই সম্ভব যে, কোন গরীবের মেয়ের কুমারী নামটী ঘুচাইয়া দিয়া তাহাদের জাতিটী রক্ষা করিতেছে!—তারপর আর—তারই!—তবু কেমন কি যে ভালবাসার ধর্ম্ম, তাহার বুকের দুর দুর ভাব কিছুতে যাইতে চাহে না!—ভাবে, যদিই স্বামী বিবাহ করিয়া নব পরিণীতাকে লইয়া, ঘরেই ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে সে কি করিবে?—

কল্পনায় একবার সতীন সতীনপো লইয়া, ঘর সংসার পাতিবার একটা চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পায় কিন্তু কিছুতে আপনাকে, সে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সংসারের মধ্যে পুরামাত্রায় খাপ খাওয়াইতে পারে না। যে রাজ্য, যে সংসার তাহার একান্ত আপনারি ছিল। সেখানে কষ্টে একটু স্থান করিয়া লইয়া যোগে যাগে দিন কাটানো সে কি প্রিয়বালার সাধ্য?

একবার ভাবিল, কিছুই না উপায় হয়, কালোপুকুরের কালো

জলেই তাহার বুক ভরা জ্বালা জুড়াইয়া লইবে। আবার তখনি ভাবিল, মরিবেই বা কি করিয়া? সতীনের সুখ দেখিয়া, সতীনের হাতে সংসারটা ডালি দিয়া, সে সংসারের ঘরনী গৃহিনী, চলিয়া যাইবেই বা কেন? জোড় করিয়া এক ভিখারিনীর কন্যার টুঁটিটা টিপিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিতে পারিবে না? মুখ ফুটিয়া একবার বলিতেও কি পারিবে না? রাক্ষসী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া কাহার অধিকারে জুড়িয়া বসিতে চাহিতেছিস্?

সপত্নীর চোক দুটী গালিয়া দিবার জন্য তাহার হাত দুটা, যেন সেই মুহূর্ত্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল!

কিন্তু সাধুকে, বলিয়া দিবার সময় ভাবিয়াছিল, যদিই বা অবুঝ স্বামি খেয়ালের বশে, একটা কাজ করিয়া থাকে, তবে সে না হয় সতীন সতীনপো লইয়াই ঘর করিবে! ভবিষ্যৎটা এমন করিয়া ভাবে নাই। হায় নিষ্ঠুর ভবিতব্য! একটা দাহ একটা দুঃসহ দাহ, তাহার সমস্ত মর্ম্মস্থান গুলাতে যেন তপ্ত লোহার শিক দিয়া, পোড়াইতে লাগিল!

প্রিয় সেই অবস্থাতে তাহার মাকে, ও পিতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। রৌদ্র ও করুণ রস দিয়া, মেয়ে মানুষ হইতে যতদুর লেখা যাইতে পারে, তাহা লিখিল, অবশেষে পত্রের শেষ অংশটী, চক্ষের জল দিয়া লিখিল! "মা যদি তোমাদের অভাগিনী কন্যার কপাল নিতান্তই ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তবে তোমরাও যেন নিষ্ঠুর হইয়া পাল্কী পাঠাইতে বিলম্ব করিও না! আমার এখন ত তোমরাই মাত্র ভরসা। ভাবিতেছি কোথাও না স্থান থাকে, তোমরা, জঠরে স্থান দিতে পারিয়াছ, দুর্দ্দিনেও আশ্রয় দিবে,"—

চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া দিয়া, আবার খাটের উপরে উবুড় হইয়া পড়িয়া ভাবতে লাগিল। কিন্তু তাহার কাণের কাছে সেই শব্দটাই

প্রবল হইয়া বাজিতে লাগিল। যেন পাড়ার সমস্ত সঙ্গিনীগণ, যাহারা তাহার সুখের ঈর্ষা করিত। এক মুহুর্ত্তে তাহাদের ক্ষুর-ধার রসনা উন্মেষিত করিয়া বলিতেছে,—প্রিয় যাহা তোমার গর্ব্ব, যাহা তোমার সর্ব্বস্ব, সেই স্বামী তোমার গেল!—এখন বাপের ঘরে রাজ্যেশ্বরীও হও আর যাই হও,—ভিখারিণীর আসনও তোমার রত্ন সিংহাসনের উপরে। প্রিয় চাদর মুড়ি দিয়া, মড়ার মত নিশ্চল হইয়া, শুইয়া রহিল।—

---

## নবম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর ফুলশয্যার যে রীতিটা আছে, মায়া তাহাতে অত্যন্ত বাঁকিয়া বসিল—মাকে কহিল তোমাদের যখন জাতিটা রক্ষা হইল, তখন আবার এ আয়োজন কেন? এ সব না ক'রলেও যখন জাত বজায় থাকে, তখন ফুলশয্যাটা নাই হইল।

মা কাঁদিতে লাগিলেন কহিলেন, সে কি হয় মায়া? ফুলশয্যা নইলে কি বিবাহ শুদ্ধ হয়? যেটা নিয়ম সেটা ত করিতে হইবে।

মায়া তবু বক্র হইয়া রহিল,—বিবাহের পর হইতে তাহার স্বামী মহিমের মুখে যে, একটা তীব্র দুশ্চিন্তার ছায়া গাঢ়তর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—সেটা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই সে আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ইতি কর্ত্তব্যতা ঠিক করিয়া লইয়াছিল বিবাহের

আগেও সে ভাবিয়াছিল,—জাতিটা ত রক্ষা হউক, তার পর সে মাতৃ-গৃহে, মাতার সহিত দুঃখের ধান্দাতেই জীবনটা ভোর করিয়া দিবে। একজনের সুখের পথে কণ্টক হইবে না। কিম্বা উপযাচিকা হইয়া, আপনার সুখের জন্য স্বামীর কাছে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইবে না। এখনও তাই যাহা তাহা বলিবার আগে হইতেই বলিয়া রাখিল।

মাঁ কিন্তু আয়োজন সরাইতে পারিলেন না, প্রতিবেশীনীদিগকে ফুলশয্যার আয়োজনটা করিতে অনুরোধ করিয়া, নিজেও যথাসম্ভব ভাঙ্গা ঘরখানি রম্য করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। মায়া কিন্তু একবার সে ঘরের দিকও মাড়াইল না। সে যাহা বলিয়া রাখিয়াছিল, কাজেও তাহা করিতে লাগিল। দুই একজন উপযাচিকা হইয়া মায়াকে সৎবুদ্ধি দিতে আসিল কহিল,—মেয়ে মানুষকে কি এতটা ভাবতে আছে, সতীন লইয়াও ত কত জনা ঘরকন্না করিতেছে।

মায়া তাহাদের একটা কথাও কর্ণপাত করিল কি না সন্দেহ। আপনার মনেই আপনার প্রত্যাহিক গুপারি কাটিয়া যাইতে লাগিল। আর ভদ্র লোকের ছেলে মহিম তাহার জন্য যে কতখানি দায়িত্বই ঘাড়াইয়া লইয়াছে, সেইটেই ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

মেয়ের রকম দেখিয়া মা হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ের রকমই বা শুধু বলি কেন। সে ত অন্যায় কিছু বলে নাই তাহার যাহা বলা উচিত তাহাই বলিয়াছে, মা আপনার মন্দ অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মহিম কিন্তু অপেক্ষাকৃত খোলসাভাবে করুণাময়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল,—এবং পরিষ্কার কণ্ঠে ডাকিল মা।

করুণাময়ী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন,—"কি বাবা ?"

মহিম কহিল,—"মা দেশ থেকে লোক এসেছে।"

দেশের নাম শুনিয়াই করুণাময়ী একবারে আঁৎকাইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভিতরে যেটুকুও আশা ছিল সেইটুকুও যেন একটা ফুৎকারে নিবিয়া আসিল সভয় কণ্ঠে কহিলেন। বাড়ী থেকে তোমায় কি খুব কড়া কথা শোনাইতেই লোক পাঠিয়েছে।

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—না মা, বলিয়া সাধু সাধু বলিয়া দুইবার ডাকিয়া কহিল,—না, ওর নাম কি বিবাহের পর আমাদের রীতি আছে,—মেয়ে নিয়ে যেতে হয়। সেই কথাটাই ব'লতে বলিয়া কেমন একটা লজ্জায় যেন চুপ করিয়া গেল!—

সাধু আসিয়া করুণাময়ীর পায়ের কাছে একটা ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—"বউমাকে পাঠিয়ে দিতে হবে না, আমিই বাড়ী হতে নিতে এলাম। আমাদের ওখানে পাত্রের বাড়ীতেই ফুলশয্যার নিয়ম।"

করুণাময়ী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, এতটা যে শুনিবেন, তাহার আশাও করেন নাই। সাধুকে কোথায় বসাইবেন, কি খাওয়াইবেন একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন!—

সাধু জীবনে অনেক বড় লোকের ঘর অনেক গরীবের ঘর ঘুরিয়াছে, মানুষকে যে কি করিয়া বুঝিতে হয় সে বিদ্যাটি তাহার ভালই জানা ছিল। নিজেই একখানা চট্ টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"মা আপনার এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নাই। এ'ত আমাদের ঘর কথা! এখন মেয়ে কাল সকালে পাঠাচ্ছেন কি না তাই বলুন!"

করুণাময়ী কহিলেন,—"মেয়ে পাঠাব না কেন বাবা! এত তোমাদেরই মেয়ে, আমি পেটে ধ'রে মানুষ ক'রেছি মাত্র। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু প্লাবিত হইয়া আসিল।"—

সাধুচরণ বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল,—"কিছু ভাব-

বেন না মা, আমাদের বাবুর আর একটী সংসার আছে ব'লে এ বউ মারও কোন অযত্ন হবে না। আমাদের কুলীনের ঘরে ওমন একছ্যাড় ত হয়েই থাকে, বলিয়া নিজ গ্রামের কে কয়টী বিবাহ করিয়াছিল— তাহার শুদ্ধ একটা তালিকা পাড়িতে বাদ পড়িল না।—

কিন্তু এই সাধুচরণ বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় আসিয়াছিল এক সুর লইয়া, ঘটনা অন্যরূপ দেখিয়া সুর ফিরাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না।

মহিম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাধুচরণের অত্যন্ত সহজ অমায়িক কথা গুলি শুনিয়া যাইতে লাগিল,—মাঝে মাঝে হাসিও পাইতে লাগিল। সাধুচরণ এখানে কি কারণে আসিয়াছিল তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। যেখানে নিষেধাত্মক না বলিয়া তাহাকে শুদ্ধ বাড়ী ফিরাইবার কথা সেখানে হ্যদ্যাত্মক হাঁ বলিয়া, এমন মনটী লওয়াইবার প্রচেষ্টা, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা সেও একটা কম ক্ষমতার কথা নহে। ভাবিল সময় সুযোগ ও শিক্ষা পাইলে এই সব লোক বোধ হয় একটা রাষ্ট্রও খুব দক্ষতার সহিত চালাইতে পারিত।

এমন সময় দূরের গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল।—

করুণাময়ী কহিলেন,—"বাবা! সাধুচরণ গরীবের ঘরের খুদ কুঁড়ো যা আছে; দুটী খেয়ে নাও।"

সাধু ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—"বিলক্ষণ! গরীবের ঘর বলেন কি? আপনাদের প্রসাদ পাওয়া সে ত আমার ভাগ্যের কথা, কিন্তু ব'লছিলাম কি বৌ-মাটীকে ত দেখা হ'ল না।"

করুণাময়ী কহিলেন,—"দেখবে আর কি বাবা! গহনা টহনা ত দিতে পারি নাই, এখনি তোমাকে পরিবেষণ ক'রতে আ'সবে।

সাধু হাসিয়া কহিল। বেশ বেশ মা, তা হ'লে ত যোগ্য বউ বটেন। বলিয়া সেই জায়গাটা ঝাঁট্ দিয়া জল ছিটাইয়া বসিয়া পড়িল!—করুণাময়ী একখানা কার্পেটের আসন আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

সাধু কহিল,—"কিছু দরকার নাই মা ওসবের, আমরা কৈবর্ত্ত-ঘরের ছেলে, ধূলোয় ব'সে খাই, তবে নিতান্ত দুঃখ কর্‌বেন ব'লে এই চটটাতেই ব'সে পড়্‌লাম।

করুণাময়ী একটী পরিষ্কার কাঁসার গেলাসে করিয়া এক গেলাস জল সাধুচরণের কাছে দিয়া দিলেন। তারপর একখানা পাতা পাড়িয়া দিয়া ডাকিলেন—মায়া, নিয়ে এসো ত মা তোমার সাধু দাদার জন্য ভাত।

প্রথমটা কুণ্ঠিতা মায়ালতা, সাধুচরণের সম্মুখে বাহির হইতে একটু আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু করুণাময়ী যখন বুঝাইয়া আসিলেন, তখন মায়ালতা কম্পিত হৃদয়ে সাধুচরণকে পরিবেশন করিতে আসিল। মায়ার অনিন্দ্যসুন্দর গঠন ও মূর্ত্তিটীর দিকে চাহিয়া, সাধুচরণ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—ইনিই কি আমাদের বউমা নাকি মা?

করুণাময়ী কহিলেন—হাঁ বাবা। ঐ রত্তি মাত্র এ অভাগিণীর নয়ন-তারা, গহণা ত আমি কিছু দিতে পারি নাই ঐ শাঁখা নোয়া ভিন্ন—সাধু বলিয়া উঠিল—এর বেশীও ত আর কিছু দিতে হয় না মা, শাঁখা শাড়ীতেই যে ভুবন আলো করেছে। এমন বউমা, তা ত ভাবি নাই। এযে সাক্ষাৎ একবারে মা ভগবতী ঠাকরুণ; বলিয়া অতৃপ্ত-দৃষ্টিতে যতক্ষণ মায়া তাহাকে ভাত দিতে লাগিল, ততক্ষণ চাহিয়া রহিল।

সাধুও ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার সমস্ত হৃদয়টা সহসা কেমন এক অপূর্ব্ব স্নেহ-রসে ভরিয়া উঠিল। ঐ চাঁপার কলির মত

আঙ্গুলগুলি, ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা আল্‌তা পরা চরণদুটী সাধুচরণের হৃদয়ের মধ্যে যেন পূজার ও আরতির আয়োজন জাগাইয়া দিল!—যে টুকুও তাহার মধ্যে গ্লানি ছিল, সেটুকুও মুছিয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন এতদিন এই অন্নপূর্ণার ধ্যান সে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু মায়ের সাক্ষাৎ মিলে নাই; আজ ভাগ্য গতিকে দর্শন মিলিয়া গিয়াছে, নহিলে এতরূপ কি. পৃথিবীতে সম্ভবে?—মহিমরঞ্জনের দিকে চাহিয়া কহিল। মহিমদা তোমায় কেউ কিছু ব'লতে পারবে না, দেখ্‌লে কারু মনের কাঁটা থাকবে না, এ আমি নিশ্চয় বল্লেম।

মহিম হাসিয়া কহিল। না সাধুচরণ তবু আমি ইচ্ছা ক'রেই এ রূপবতী কন্যাকে বিবাহ ক'রতে চাই নাই। গরিবের জাতিটী রক্ষা কর্‌তেই আমাকে প্রয়াস পেতে হয়েছিল, যখন দেখ্‌লাম কোন উপায় নাই, তখন আমাকেই বিবাহ ক'রতে হলো।

তাহার চক্ষে প্রিয়বালা তখনও প্রবল। প্রিয়-স্মৃতি তখনও তাহার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া ছিল। মায়ার সৌন্দর্য্যটুকু তাহার আঁধারটী রাঙ্গিয়া দিয়াছিল মাত্র।

কথাটা মায়ালতারও কাণে গেল। সে ভাবিল, তাহাকে যথাসম্ভব পাশ কাটাইয়া চলিতে হইবে। মহিমের উপরে তাহার যে ভক্তিটা ছিল, সেটী আরও বাড়িয়া গেল। ভাবিল, রূপ দেখিয়াই তিনি বিহ্বল হয়েন নাই। যে জীবন প্রভাতের প্রথম সঙ্গিনী, সে অরূপাই হউক, আর কুৎসিতাই হউক, তাহাকে তাঁহার ভুলিবার উপায় নাই, সংকল্প করিল। সে আপনাকে বঞ্চিতই রাখিবে, রূপের ইন্দ্রজাল লইয়া একটা ভালবাসার জগতে দাবানল জ্বালাইয়া তুলিবে না!

ফুলশয্যায় পাঠাইবার সময় করুণাময়ী যখন তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, মায়া তখন এমন বাঁকিয়া উত্তর দিল যে, করুণা-

ময়ীর যাহাও আশা ছিল, বিলুপ্ত হইয়া গেল। আবার তিনি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

অনেক বিলম্ব দেখিয়া, এবং ঘড়ির কাঁটাও একটার ঘরে যায় দেখিয়া মহিম বাহিরে আসিয়া কহিল, তবে না হয় ফুলশয্যাটী আমাদের দেশেই হবে, আমি ঘরের কবাট বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ি।

করুণাময়ী মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া কাতরতা-ব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—না বাবা নিয়ম রক্ষা না কর'লে কি চলে? আমার অবুঝ মেয়ে, দুকথা বোঝাচ্ছিলুম,—তোমারই চরণের যোগ্য ক'রে।—

মহিম আহত হইয়া ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। করুণাময়ী এবার মায়াকে ধরিয়া কহিলেন, মায়া, তোর মা একটু বোধ শোধ কি নাই? ষেটের কোলে ষোল সতের বয়স হ'তে গেল। শুন্‌লি ত জামাই রাগ ক'চ্চেন। ঘরে যাও মা, লক্ষ্মী মা আমার। যদি রাগ ক'রেই যান তাহ'লে!—

বড় জ্বালার মধ্যেও মায়ার একটু হাসি আসিল, ব্যঙ্গ করিয়া কহিল,—জামাইএর ত তোমার আর আমার জন্য ঘুম নাই? কিন্তু দেখ মা আমি যেতে পারি, আমার একটা কথা শুন্‌বে? করুণাময়ী মায়ার কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিয়া কহিলেন। কি মা তুমি কি ব'লবে? ঝুঁকিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মায়া কহিল,—এই ব'লবো, শোন আজকের রাত্রিটীর মত! তারপর আর আমায় কখনো স্বামির ঘরে যেতে অনুরোধ ক'রবে না? আমিও এই এক রাত্রিতেই আমার সব শোধ-বোধ চুকিয়ে আসবো। বলো! বলিতে বলিতে তাহারও বড় বড় চোকদুটী জলে ভরিয়া আসিল। মাতাও কন্যার মনের ভাব বুঝিয়া অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিলেন; তারপর কন্যার চোক মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, এ

খ্যাপামি কেন মা তোমার? সতীন নিয়েও ত কতজনা ঘর কন্না ক'চ্চে!

মায়া একটু উচ্চ কণ্ঠেই কহিল, আমি কি সেই ভাবনাই ভাবছি? আমি ভাবছি, যে একজনাকার সুখের পথে কাঁটা কিছুতেই হ'তে পারবো না, যে মন সেই স্ত্রীতে ভ'রে আছে, সে মনে আমি দাগা স্বরূপ হ'য়ে জাগি কেন? বিবাহ ক'রেছেন—তোমার দুঃখে গ'লে গিয়ে, তাই ব'লে গ্রহণ করাবার জন্য এ অনুযোগ কিসের জন্য? তোমার যা দরকার ছিল—জাত রক্ষা হওয়া, তা ত হ'য়েছে। আবার কেন?

করুণাময়ী অশ্রু অবরুদ্ধ-স্বরে কহিলেন, আমার এমন গুণবতী মেয়ে তারজন্য কি মায়ের এতটুকু দুঃখ হয় না, মায়া কথা কাটিস্ না! একটী রাত্রিও আমার প্রাণে স্বর্গ এ'নে দে! তারপর ছেলে পিলে একটা হ'লে তোরও একটা ভরসা হয়, আমারও ভাবনা যায়।

মায়া আর অধিক ইতস্ততঃ করিল না। মাকে কহিল—এই প্রথম আর এই শেষ রাত্রি বলিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে স্বামীর ঘরের দিকে যাত্রা করিল।

আজ তাহার মধ্যে যতটুকু পূজার আয়োজন জাগিতেছিল, বিসর্জ্জনের বাদ্যও তত গভীর সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। হাস্য ও হাহাকার, পুলক ও অশ্রু, জীবন ও মরণ সবাই একসঙ্গে যেন তাহার দুয়ারের কাছে, কান্নাপুরী বাধাইয়া তুলিয়াছিল। বালিকা মায়ার এতটা সাধ্য ছিল না, যে তাহার যথা সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। এই অবস্থাতেই তাহাকে স্বামীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইতে হইল।

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

মহিম তখনও জাগিয়াছিল। বিবাহের পর হইতে যে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া তাহার মনের উপর গাঢ়তর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সাধুচরণ সেটী আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। প্রিয়বালা যে সতীন লইয়াও ঘর কন্না করিবে, এই কথাটী যেন তাহাকে অন্ধকারের মধ্যে কূল দিল। ভাবিল যাই হোক, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, যজ্ঞকুণ্ড সমীপে যে মায়ালতাকে, জীবন মরণের সঙ্গী করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, সে সত্যটার যে আংশিকও পালন করিতে পারিবে, এই ভরসায় তাহার সমস্ত বক্ষ ভরিয়া রহিল। কর্ত্তব্যটীও যেন আর এক বেশে তাহার চক্ষে দেখা দিল! সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বালার উপরেও তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। এই প্রিয়বালাই ত তাহাকে স্বেচ্ছায় তাহার আসন ছাড়িয়া দিতে পারিব বলিয়াছে বলিয়া আজ তাহার কর্ত্তব্যের পথ বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে! মনে মনে কহিল, আমিও দেখাইব, তাহার এ ত্যাগের মূল্য দিবার সাধ্য আমার আছে। আমিও নিতান্ত অপদার্থ নহি!

এখন মায়ালতাটীই তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। অভাগিনী বালিকা তাহার দুঃখিনা মায়ের কন্যা। জীবনে সুখ বলিয়া যে কথাটা আছে, সে বোধ হয় তাহা কল্পনাও করে নাই। সে হয় ত ঠিক করিয়া লইয়াছে, মরু-বক্ষেই তাহার জন্ম, মরু-বক্ষেই সে ঝড়িয়া যাইবে। দীর্ঘ মরু পারে, বিরাট একটা প্রেম সঙ্গম তীর্থে, নদী যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, সার্থকতায় পৌঁছিতে পারে, এ বিশ্বাসও হয়ত তাহার নাই। মহিম স্থির করিল—এ বিশ্বাস তাহার ভাঙ্গাইতে হইবে।

তাহাকে জানাইতে হইবে—এ আনন্দের জীবন, আনন্দেই বহিয়া যায়—সুখে দুঃখে আনন্দ সঞ্চয়ই মাত্র তপস্যা। আরও জানাইতে হইবে।, সুখ, সাধ, আশা, মানব হৃদয়ে যাহা স্বতই স্পন্দিত, তাহাও মিথ্যা নয়—এই ভাবেই ভোর হইয়া নব পরিণীতার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া চাহিয়া রহিল।

মায়া ঘরের মধ্যে প্রবেশিতেই মহিম বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল!

মায়াও মায়ের শিক্ষা মত, তাহার স্বামীকে, একটা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহিম মনে মনে তাহাকে 'আয়ুষ্মতী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া একগাছা ফুলের মালা তাহার গলায় পড়াইয়া দিল।

মায়া সঙ্কুচিত হইয়া অবগুণ্ঠনটী টানিয়া দিল। মহিম মায়ার একটা হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—আজকের এই রাত্রি মায়া একান্ত আমোদেরি রাত্রি, এই দিনে হাসতে হয়, ভালবাসতে হয়। মলিন হ'য়ে থাকতে নাই।

স্বামীর এই সহসা উচ্ছ্বসিত সোহাগটী যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। কিন্তু কুটিয়াও কিছু বলিতে পারিল না, মনে মনে কহিল,—এক রাত্রির মত আমায় ভালবাসুন,—যেমন খুসী তেমনি বলুন,—তারপর আর নয়। মায়ার নীরবতা দেখিয়া মহিম কহিল, দোজবরে বর ব'লে আমাকে কি তোমার পছন্দ হ'চ্চে না। আমি কিন্তু ভালবাসতে পারি, ভালবাসতেও জানি, দায়ে পড়ে বিবাহ ক'রতে হ'য়েছে—ব'লে তুমি ত আমার স্ত্রী বটে, কুলীনের ঘরে কতজনাকার যে দুবার বিয়ে হ'য়ে যায়, তাই ব'লে কি তারা দুই স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে না? বিশেষ এমন রূপবতী পত্নীকে!

এই কথায় মায়ার ভিতরকার সুপ্ত নারী প্রকৃতি যেন জাগ্রত

হইয়া উঠিল—মহিমের বাহু বেষ্টনী ছাড়াইয়া সরিয়া আসিয়া নতমুখে কহিল,—যা বল্লেন, আর ব'লবেন না। ও হৃদয় কার, তা কি আমি জানি না। গরিবের মেয়েকে বিবাহ ক'রে জাত রক্ষা ক'রেছেন, এই যথেষ্ট ; আবার ভালবাসার কথা কেন ?—আমি তা চাইও না! বিবাহের আগেও ত আপনার সঙ্গে সে সর্ত্ত ছিল না। চিরকাল অভাবের সংসারে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া, লজ্জাটাও তাহার তত ছিল না, যেটা সত্য বলিয়া প্রাণের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে, সেটা স্বামীই হোন আর যিনিই হোন, প্রকাশ করিতে একবারেই নিঃসঙ্কোচ হইয়া বলে। লৌকিকতার ভাণও একটা রাখে না!

মহিম অবাক্ হইয়া মায়ালতার দিকে চাহিয়া রহিল। এতটা বোধ যে কোন বালিকার থাকিতে পারে, একথা মহিমের কোন দিন স্বপ্নেও মনে হয় নাই। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ মায়ার দিকে চাহিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—মায়া এই বিসর্জ্জনই তোমায় প্রতিষ্ঠার আসন দেবে। আমি বুঝতে পাচ্ছি, তোমার এ জীবনটা শুধু বিফলে ব'য়ে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয় নাই ; তুমি সুখ পাবে সৌভাগ্য পাবে, এ আমি বড় গলায় বল্লাম।

মায়া অবনত হইয়া সকল কথাই স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু মহিমের আবেগ বিহ্বলতার মুখে আপনাকে বেতসী লতার মত অবনত করিয়া দিল না। তাহার মধ্যে যে একটা ত্যাগ, যে একটা মহত্ব, আপনার নিজস্ব বিশিষ্টতা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেটা স্বতন্ত্র হইয়াই রহিল। মায়াও বুঝিল, তাহার জীবনে মনের এই বলটুকু ভিন্ন আর কিছু সম্বল নাই।

সকালবেলায় উঠিয়া মহিম সাধুচরণকে কহিল,—সাধু দা, এতটা মহত্ব কোন মেয়ে মানুষে যে কোন দিন দেখবো, তা আশাও করি

নাই! একদিনের ব্যবহারেই যতদূর বুঝেছি, তাতে তুমি যা, ব'লেছ, ওমেয়ে তার সব কাঁটা ধগু ক'রে ফুল ফোটাতে পার্ব্বে, তা নিশ্চয় পার্ব্বে, ঘরের শান্তি ওর গমনে বেড়েই যাবে। আমি মনে ক'রেছিলেম নিয়ে যাবো না, কিন্তু—দেখছি নিয়ে যেতেই হ'বে।

সাধুরও ইচ্ছা তাহাই। সে সকাল হইতে করুণাময়ীকে তাড়া দিতে লাগিল! কহিল দুপুরের ট্রেনেই জামাই মেয়েকে রওনা করিয়া দিতে হইবে!

করুণাময়ী আজ তাই কোন কাজে বল পাইতেছিলেন না; যেখানে যাইতেছিলেন, সেই খানেই বসিয়া পড়িতেছিলেন। বক্ষের পঞ্জরগুলা যেন এক একটা করিয়া ধসিয়া যাইতেছিল। এতদিন যে কন্যাকে বক্ষে ধরিয়া; মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ধারায় এই নিরালা কুটীরে একটা আশার বাতি জ্বালাইয়া, সুখে দুঃখে দারিদ্র্যে শোকে, ঐ এক মায়ালতার দিকে চাহিয়া, যাঁহার এতগুলা দিন কাটিয়া গিয়াছিল; সেই মায়ালতাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া মা কি করিয়া নিশ্চন্ত হইয়া রহিবেন, সেই কথাটী চিন্তা করিতে করিতে তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন। কেহ একটা কিছু বলিলেই তাঁহার চোক দিয়া হু হু করিয়া জল আসিতেছিল। ধৈর্য্য যেন আর কিছুতেই ধরিতে পারিতেছিলেন না!

প্রতিবেশিনী বিন্দুর মা আসিয়া কহিল, হাঁগ মায়ার মা, তোমার কি আজ কান্নার দিন! মেয়ে জামাইকে পাঠাতে হ'বে, দেশ থেকে লোক এসেছে তার একটু হুঁস রেখেছ।

করুণাময়ী কহিলেন,—জানি বিন্দুর মা, বুঝিও সব, তবু আজ স্থির হ'তে পাচ্চি না। বুকের পাঁজরের মধ্যে যে মায়া আমার জড়িয়ে ছিল, আমার দুঃখে মায়া, রোগে মায়া, শোকেমায়া! সেই মায়াকে

—বলিতে বলিতে অজস্র চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল ! এ বিচ্ছেদে সান্ত্বনা দেওয়াও প্রতিবেশীদের সাধ্য ছিল না।

বেলা দশটার পর সাধুচরণ একখানা ঘোরগাড়ী ডাকিয়া আনিয়া দুয়ারে উপস্থিত করিল ! এই গাড়ী রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবে।

তখন করুণাময়ী বুঝিলেন, তবে কন্যাকে নিশ্চয় বিদায় দিতেই হইবে।

কিছুক্ষণ কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ও কন্যাকেও কাঁদাইয়া, তারপর মহিমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন !

মহিমের দুটী হাতে মায়ালতার দুটী হাত এক করিয়া দিয়া অশ্রু নিরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, বাবা মহিম ! তোমারি হাতে আমার মায়াকে দিলাম, দয়া ক'রে তুমিই এ গরিবের দায় উদ্ধার ক'রেছ, দয়া ক'রে তুমিই তাকে দেখো। সংসারে একে দেখবার আর কেউ নাই। তুমিই স্বামী, তুমিই এর গতি-মুক্তি। আর বলিতে পারিলেন না, নিরুদ্ধ অশ্রু প্রবাহ তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া দিল।

সাধুচরণকেও করুণাময়ী অনেক বলিয়া দিলেন। কহিলেন, দায়ে প'ড়েই মহিমকে আমার মায়াকে ঘাড়ে ক'রতে হ'য়েছে, তাই বলে মেয়েও আমার অযোগ্য নয়, কেমন ক'রে পাঁচটাকে নিয়ে ঘর ক'রতে হয়, তা ও বেশই জানে। মহিমের মায়ের নাম করিয়া কহিলেন, বেহানকে ব'লো, আমার মায়া গরিবের ঘরের মেয়ে হ'লেও চিরকাল আমার বুকটী জোড়া হ'য়ে ছিল। খাওয়া পরার কষ্ট সইতে পার্ব্বে, কিন্তু হেনেস্থা সইতে পারবে না !

সাধুচরণ আশ্বাস দিয়া কহিল, সাধুচরণ নিজে যখন সঙ্গে যাই-তেছে, তখন কাহারও কিছু বলিবার রহিবে না। এমন কি শুক্লপক্ষ প্রিয়বালা পর্য্যন্ত—

করুণাময়ী কহিলেন, বেহাইকেও ব'লো। ঘরে দাসী বাঁদীও ত তিনি রাখেন, আর একটা দাসীই যেন তাঁহার সংসারে গেল! ছেলে-পিলের পাতের ভাতেই তার পেট ভ'রবে। নতুন কিছু তার জন্য পোহাতে হবে না! মায়ের যাহা বলিবার তাহা বলিয়া, গাড়ীর মধ্যে, মেয়ে জামাইকে তুলিয়া দিয়া আর একবার তাহাদের মুখ চুম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন!

মায়া এতক্ষণ নীরবেই চক্ষের জল ফেলিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। দুঃখিনী মায়ের দিকে চাহিয়া—মায়ের শূন্য ঘরটীর পানে চাহিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় যেন নীড়চ্যুত বিহঙ্গ-শাবকের মত ছট্ ফট্ করিয়া উঠিল! দুইটী হস্তে মায়ের গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মা আবার আমায় আনবে ত?—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। তুমি যে আমার কাঙালিনী মাগো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল!

প্রতিবেশিনীরা যাহারা ছিল, তাহারা সান্ত্বনা দিয়া কহিল, তোমায় আনবে বৈকি মা, তুমি নইলে দুঃখিনীর কুটীর এসে কে আলো ক'রবে! আশ্বিন মাসের পূজোর আগে নিশ্চয়—তোমায় নিয়ে আসবে—

তাহাদের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও গাড়ী যখন ছাড়িয়া দিল, তখন মায়া দুই হাতে মুখ মুছিয়া হাপুষ নয়নে কাঁদিয়া কহিল,—মা চিঠি দিও মা, প্রতিদিন একখানি ক'রে দিও; কেমন থাকো মা তোমার আর কেউ নাই মা!—যাও চিঠি লিখিব বলিয়া সতৃষ্ণে যতক্ষণ গাড়ী-খানি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর করুণাময়ী গাঢ় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ঘর অন্ধকার! ঘরের মধ্যে প্রবেশিতেই যেন

চিত্তটী নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসিল ; মনে পড়িল মায়া নাই ! শূন্য প্রাণটা যেন অনন্ত শূন্যের দিকে চাহিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল ! শূন্য পুরীটাও যেন তাঁহার সে ক্রন্দনে যোগ দিল। ঘরের দেওয়াল পুঁই মাচা, কোথায় না মায়ার হাত নাই। ঘরের মধ্যে হাঁড়ি কলসীতেও যে মায়ার চিহ্ন বিদ্যমান।

তখন মায়ের কন্যার বাল্য কৈশোর বিবাহ, সকল অবস্থার কথাই মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, মায়া তাহার মায়ের কতখানি অন্তরের ছিল। দ্বাদশীর দিন আগে মাকে না খাওয়াইয়া মায়ার তৃপ্তি ছিল না। সুপারি কাটিতে মায়াই একা মায়ের অর্দ্ধেক সুপারি কাটিয়া দিত। পরনের কাপড় ছিঁড়িলে গরিব মাকে, সাহস করিয়া একখানা কাপড়ও চাহিত না। মায়ের ব্যথার ব্যথী, মায়ের দুঃখে দুঃখী মেয়ে যে তাহার মায়ের সমস্ত বুকটা জোড়া হইয়া ছিল !

তবু আজ করুণাময়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলেন না। ভাবিলেন,—যদি আমার কন্যার কোন অমঙ্গল হয় ? ঠাকুর ঘরে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিলেন,—ঠাকুর ! দুঃখিনীর আর ত কোন সম্বল নাই, ঐ একটী মাত্র রত্ন যদি মানুষের হাতেই দিলে, তবে হে ঠাকুর তার সমস্ত দুঃখ সার্থক ক'রে নিও ! তাকে বল দিও ! মায়ার একখানা পুরাতন পরনের কাপড় বুকে জড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন। আজ আর তাঁহার খাওয়া দাওয়ারও কোন বালাই নাই !

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

বর ক'নের গাড়ী যখন বাড়ী হইতে ক্রোশেক দূরে অবস্থিত, তখন সাধুচরণ আসিয়া সমস্ত সংবাদ প্রদান করিল এবং সংবাদটী অতি শীঘ্রই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল।

বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া পিতা যোগনাথ ত একবারে চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সাধুচরণও বুদ্ধিমান ছিল, কি করিয়া যে মন লওয়াইতে হয়, সে বিদ্যাটী তাহার ভাল রূপই জানা ছিল। কহিল নববধূটীও তাহার মায়ের একটী মাত্র কন্যা এবং কলিকাতাতে একখানা বাড়ীও আছে, আরও খানিকটা মিথ্যা বিশেষণ যোগ করিয়া লুব্ধ যোগনাথকে শান্ত করিয়া দিল। মাতা ক্ষেমঙ্করীকেও ঐ যুক্তিতে ভোলাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগটী ঘটিয়া উঠিল না। তিনি প্রিয়বালার কাছে মুখটী কুলালচক্র করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন।

গ্রামোপকণ্ঠে বালক বালিকা ও পাড়ার ঝী চাকর যাহারা ক'নে দেখিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ছুটিয়া আসিয়া ক্ষেমঙ্করীর কাছে শত মুখে নববধূর রূপের প্রশংসা করিয়া যাইতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন বউ তাহাদের এ পরুশে আসে নাই। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ।

ক্ষেমঙ্করী তবু বক্র হইয়া রহিলেন। অভাবের সংসারে আবার যে একটা দায় আসিয়া জুটিতেছিল, এই ভাবনাতেই তিনি মুষড়িয়া ছিলেন। তাহার উপর প্রিয়বালার বাপের বিষয়টীও তাঁহাকে কম দোলা দেয় নাই; হৃদ্যতা করিয়া প্রিয়বালাকে ডাকিয়া কহিলেন।

ওরা নতুন বৌ ঘরে আসুক মা; আমরা তাদের কিছুতে নাই। কিছু দেখ্‌বোও না শুন্‌বোও না।

প্রিয়বালাও কিছু না বলিয়া নীরবে আপনার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। বাহিরের সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সকৌতুক দৃষ্টি তাহার সহ্য হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, যেন প্রত্যেকটা আঁখি হইতে একটা বিদ্রূপ ব্যঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার দিকে, বক্র হাসিয়া বলিতেছে;—নারী তোমার গর্ব্বের পরমায়ু আর কয় দিন! স্বামী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া গেল! কিন্তু বিবাহের সংবাদ শুনিয়া এই প্রিয়বালাই প্রথমটা মনে করিয়াছিল, নব দম্পতীকে না হয় সে-ই বরণ করিয়া লইবে; কার্য্যক্ষেত্রে দেখিল ভবিতব্য অন্যরূপ।

এমন সময় বাহিরে গাড়ী থামার শব্দ শ্রুত হইল।

প্রতিবেশিনীরা কহিল, যাওগো মহিমের মা; বর ক'নে ঘরে তুলে নিয়ে এ'সো। ক্ষেমঙ্করী তথাপি শক্ত হইয়া রহিলেন।

মহিমের জেঠাইমা, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; যদিও, পৃথক হইয়া উভয় যা'র অনেকদিন পর্য্যন্ত মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল, তথাপি মহিমের দ্বিতীয় বিবাহের খবর পাইয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। আসিয়াই ক্ষেমঙ্করীর দিকে, এক তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন;—ছোট বউ তোমার এ রকম কি? দায়ে পড়ে মহিম যদি, গরিবের এক মেয়েকে বিবাহ ক'রে এ'নেই থাকে? কুলীনের ঘরেই কি আর অকুলীনের ঘরেই কি দু'বার বিয়ে কি কোথায় না হয়? ব'র ক'নে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো, আর তুমি মা, এইখানে ব'সে রইলে? ক্ষেমঙ্করীর রকম সকম দেখিয়া তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি উঠানের মধ্যে একটা মঙ্গল ঘট স্থাপন করিয়া উলুধ্বনি দিয়া শঙ্খ বাজাইয়া বর ক'নে বরণ করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। এবং ক্ষেম-

ঙ্করীকেই সর্ব্বাগ্রে নববধূর লজ্জাবরণ উন্মোচন করিয়া মুখখানি দেখাইয়া কহিলেন, দেখ দেখি ছোট বৌ, এমন বৌ এ পরশে এ'সেছে? একখানি গহনা নাই, তবু রূপ ঠিক্‌রে বেরুচ্চে। ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বেঁচে থাকো মা সুখে থাকো, পাকা চুলে সিঁদুর পরো, হাতের নোঁওা বজ্র হোক।

ক্ষেমঙ্করীও কি করেন, নিজের পুত্রের মঙ্গলের জন্য একটা নিয়ম রক্ষা গোচ আশীর্ব্বাদ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

মহিম জেঠাইমাকে প্রণাম করিয়া কহিল, শুধু রূপ দেখেই বিবাহ করিনি জেঠাইমা, নিতান্ত গরিবের মেয়ে জাত যায় ব'লেই বিয়ে ক'রতে হলো!

জেঠাইমা কহিলেন,—তা মেয়ে দেখেই বুঝতে পাচ্চি বাবা, তা সুখে থাকে, দুই স্ত্রী নিয়েও ত কতজনা ঘর সংসার ক'রে। আর বড় বৌএর ও ত এদ্দিন পর্য্যন্ত একটা ছেলে হ'লো না, তুমি এ বিয়ে না কর্লেও আর দু'বছর পরে আবার তোমার বিবাহ দিতে হ'তো। ছেলে হবে ব'লে ত আর আশাই নাই। আমিও তোমার বাবাকে ওকথা একবার ব'লবো, মনে করেছিলাম।

নববধূ লইয়া জল্পনা কল্পনা, আলোচনা অনেক চলিতে লাগিল। শুধু পড়িয়া রহিল প্রিয়বালা! সেই কেবল বাহিরে বাহির হইতে পারিল না।

সে তখন মনে মনে ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনাটী করিতেছিল, ঠাকুর কখন বাপের বাড়ী হইতে পাল্কী আসে, কখন সে এখান হইতে চলিয়া যায়। এ আগুনলাগা পুরীতে একদণ্ড তাহার তিষ্ঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সে প্রথমটা অনেক বলে আপনাকে খাড়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু নববধূর রূপের প্রশংসায় তাহার অভিমানী

নারী হৃদয় তাহাকে একবারে পুচ্ছবিমর্দ্দিতা ভুজঙ্গিনীর মত দহ্যমানা করিয়া তুলিল। স্বামী যে তাহার দায়ে পড়িয়া এক গরিবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, এ কথাটা কিছুতে ভাবিতে পারিল না। কেবল ভাবিতে লাগিল রূপ আর রূপ। রূপেই তাহাকে মজাইয়াছে, এতদিন কিন্তু এই প্রিয়বালার রূপেই তাহার পোষাইয়াছে, আর কেন পোষাইল না? বাহির হইতে যখন তাহার খাবারের জন্য ডাক পড়িল, তখন সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না তাহার আবার খাবারের কোন প্রয়োজন আছে?

সন্ধ্যার দিকে, স্বামী মহিমরঞ্জন, বাহির হইতে প্রিয়বালার ঘরের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিয়া কহিল,—ওঠো আগে সব কথা শোনো, তারপর না হয় দুষো।

প্রিয়বালা কিন্তু কিছুতে উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিতে পারিল না। নারী তখনও আপনার জ্বালাতেই খাক হইয়া জ্বলিতেছিল। একবার মনে হইল, এই সময় স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া বলিয়া আইসে, কি দোষে এই শাস্তি দিলে। কিন্তু এই মহিমই না কতদিন তাহার পিতার কাছ হইতে অর্থপ্রাপ্তির আশায়,তাহার কত তোষামোদ করিয়াছে, একটু অভিমানে পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়াছে, আর আজ দিন কিনিয়া লইয়া এই ব্যবহার? যতটুকুও তাহার মন নরম হইয়া আসিতেছিল। এই অতীত কথা স্মরণ করিয়া, ক্ষোভে রোষে ও দাহে, একবারে জ্বলিয়া উঠিল। সবলে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া, দুয়ার না খুলিয়াই কহিল, আজ আর ডাকতে লজ্জা হয় না? এখন সাধ্যে ডাকবে তোমার নতুন বৌকে, আমি কে? যখন টাকা ছিল, পয়সা ছিল, রূপ ছিল, তখন আমি তোমার ছিলাম। আবার কেন?

মহিম কহিল, তুমি কেউ না হও দুটী খেতে ত আর দোষ নাই।

প্রিয়বালা পূর্ব্ববৎ প্রদীপ্ত স্বরেই কহিল, আবার তোমার এখানে খাবো? তার চেয়ে বিষ খাই না কেন?

মহিম তাহার স্ত্রীর স্বভাব জানিত, ভাবিল আর বাড়াবাড়িতে প্রয়োজন নাই, শেষকালে এই ব্যাপার কোন প্রলয়েই বা পর্য্যবসিত হয়,—ক্ষুণ্ণমনে সেখান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সংকল্প করিল, একদিন তাহাকে এবার্ত্তা জানাইতে হইবে, যে আমি দোষী নয়, সাধ করিয়া এ ফাঁস গলায় পড়ি নাই, দারুণ নিয়তি নিষ্ঠুর ভবিতব্য তাহাকে এপথের পথিক করিয়াছে!—আসিবার সময় কেবল একটা কথা বলিয়া আসিল, বিয়েটী আমিই ক'রেছি নিশ্চয়। কিন্তু বউ নিয়ে আসবার সাহস কখনো হ'তো না, যদি সাধুকে দিয়ে তুমি ব'লে না পাঠাতে!

প্রিয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, সেই পাপে যদি এই শাস্তি হয়, তবে এই জ্বালার বুকে বাজ হেনে যাও। তুমি আমার বুকে আগুণ জ্বালিয়েছ, শ্মশানের চিতেটীতেও আগুণ ধরিয়ে দাও; বলিতে বলিতে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আজ আর তাহাঁর ক্রন্দনেরও পরিমাণ ছিল না, শরতের দিগন্ত প্রসারিত অনন্ত নিলিমার বুকে একটা লীলায়িত মেঘ তরঙ্গের মত ক্ষণে ক্ষণে একটা হাহাকার, অশ্রু বেদনা ও বাষ্পে মণ্ডিত হইয়া তাহার সমস্ত বক্ষ-রক্তটাকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছিল। যখন বড় রকমের একটা কিছু তাহাকে বাজিতেছিল, তখন গর্জ্জিয়া অভিমানে নাগকন্যার মত শতধারে আপনাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছিল; যখন কোমল রকম কিছু তাহার মর্ম্মে পৌঁছিতেছিল, তখন অশ্রুধারায় গলিয়া ঝরিয়া আপনাকে, সান্ত্বনা দিতেছিল। আজ তাহার দুঃখ যত

বেদনা তত, অশ্রুও তত, আবার দীর্ঘশ্বাসও তত প্রবলতর। সে তাই ঘরের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া ফোঁপাইতে লাগিল,আর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। এবং দীর্ঘশ্বাসগুলা এমন ভাবেই তাহার মধ্য হইতে বাহির হইতে লাগিল যেন সেগুলা লোক লোকান্তর ছাপাইয়া, ঈশ্বরের দরবার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, এমন প্রচেষ্টাও আছে।

মহিম তাহার মা ক্ষেমঙ্করীকে আসিয়া কহিল, মা তুমি যদি বড় বৌকে বুঝিয়ে ব'লে ঠাণ্ডা কর'তে পারো, নইলে আমার দ্বারা আর সে সাধ্য নাই।

মা কহিলেন বিয়ে করবার সময়ই ত তোমার জানা উচিত ছিল আর সে বউকে তেমন পাবে না, সতীনের হিংসা যে বড় হিংসা মহিম!

মহিম "অদৃষ্ট" বলিয়া চলিয়া গেল।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত অন্ধকার রাত্রি একাকী বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া ভোরের সময় মহিম নদীতীর দিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই নদীতীরে বসিয়া সে বাল্যের কৈশোরের কত দুশ্চিন্তার অবসান করিয়াছে, আজও সেই ভরসায় এখানে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আজ কল্লোলময়ীর অন্ত-সুর। যে সুরে তাহার মনোবীণা, নূতন একভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিত সে সুর যেন তাহার নাই। তাহারই হৃদয়াকাশের মত একটা গভীর ম্লানিমা, তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, আকাশও আজ ধূসর মেঘে সমাচ্ছন্ন! মহিম একটা আবর্ত্ত সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

একের বিসর্জ্জন ব্যতীত, অন্যের প্রতিষ্ঠা নাই। অন্যের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত একেরও শ্রেয়ো নাই। কিন্তু দুয়েরই মায়া ফাঁশ যে দুরধিগম্য তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে দুইটীরই আসন পাতা হইয়া গিয়াছে, মায়া-লতাকে, বিবাহের পূর্ব্বে বলিয়াছিল বটে, তাহার মায়ের জাতিটী রক্ষা করিয়া, তারপর যেখানকার সেইখানেই ফিরিয়া আসিবে কিন্তু বেদমন্ত্র যে অন্যরূপ বিধান দিল। অভাগিনী মায়ার ছল ছল দুটী করুণ আঁখিও যে অন্যরূপ বলিল।

ভাবিতে লাগিল। প্রিয়বালাও ত তাহার হৃদয়ের খবর জানে তবে কেন এমন কঠোর হইল? আমার ত তাহার পরে এখনও এতটুকু বিতৃষ্ণা হয় নাই। তবে সে আগে হইতে এমন বাঁকিয়া বসিল কেন? মায়ালতাও ত সেরূপ নয়। সতীনের পরিচয় লইয়া সতীনের সহিত ব্যবহার করিয়া, তারপর বক্র হইল না কেন?

যে কথা প্রিয়বালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার বলা উচিত ছিল সেই কথাগুলা দলে দলে তাহার মনোরাজ্যে ওলট পালট করিয়া দিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

এমন সময় মহিমের পাড়ার জনৈক আত্মীয় ভাই মহিমকে আসিয়া কহিল মহিম দা কাঁটাপুকুর হ'তে আপনার শ্বশুর মশাই এসেছেন। তিনি একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাচ্চেন।

শ্বশুরের নাম শুনিয়া মহিম চকিত হইয়া উঠিল। কহিল তিনি এসেই সব শুনেছেন কি বলো?

আত্মীয়টী কহিল। তা আর শোনেন নাই! একবারে মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী বেহারা পর্য্যন্ত এনে হাজির ক'রেছেন। কেবল আপনার সঙ্গে তাঁর দুটো কথা কহার অপেক্ষা মাত্র।

মহিম কহিল বাবা কি ব'লছেন!

আত্মীয়টী কহিল তিনি আর কি ব'লবেন। তিনি চুপ ক'রে কেবল তামাক টানছেন। আপনার শ্বশুর বোধ হয় আপনার পড়ার খরচ সম্বন্ধেও কি করেন বোধ হয় বলিয়া আত্মীয়টী জমির আইল দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল।

মহিম চিন্তান্বিত ভাবে বাড়ী ফিরিতে লাগিল। ভাবিল যদিই শ্বশুর টাকা না দেন তাহাতেই কি আসে যায়, তবু মায়ালতাকে পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করিল নিজেই নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তবু অর্থের খাতিরে একটা জীবনের সুখ সৌভাগ্য দলিয়া যাইবে না।

বাড়ীর মধ্যে যখন উপস্থিত হইল তখন দেখিল স্ত্রী প্রিয়বালা আগে হইতে পাল্কীতে চড়িয়া বসিয়া আছেন।

আর শ্বশুর শিখরেশ্বর পিতার সহিত তামাক খাইতে খাইতে কথা কহিতেছেন।

মহিমকে দেখিয়াই শিখরেশ্বর কহিয়া উঠিলেন তা হ'লে আমার মেয়েকে নিয়ে চল্লাম বাবা, সবই শোনা গেছে, এখন সুখেই থাকো। তোমাকে আমার "ল" পড়াবার পর্য্যন্ত খরচ দেবার যে একটা সর্ত্ত ছিল সেটা যে বন্ধ হ'য়ে গেল তা বোধ হয় তোমাকে খুলে না ব'ললেও চলে। উদ্দেশে প্রিয়বালাকে ডাকিয়া কহিলেন প্রিয় তোমার স্বামীর কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে প্রণাম ক'রো আর যদি—শেষটী বলিতে পারিলেন না।

প্রিয়বালা পাল্কী হইতেই মহিমকে একটা প্রণাম করিল।

পিতা ও শ্বশুরের সমক্ষেও মহিমের চক্ষু দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বেহারারা পাল্কী তুলিয়া দিল। মহিম তবু কহিল। এটা কি ভাল হ'লো আপনাদের? আপ-

নারা ত শুনেছেনই আমি ইচ্ছা ক'রে এবিবাহ করিনি তবু আপনারা যদি আমার আচরণকে গর্হিত বিবেচনা করেন,—তাহ'লে আমারও কিছু বলবার নাই। কিন্তু আমি জানি, তিনি আমার সেই স্ত্রী আছেন। আমিও আপনাদের সেই জামাই আছি।

শিখরেশ্বর প্রবলভাবে শির সঞ্চালন করিয়া বেহারাদিগকে পাল্কী চালাইতে আদেশ দিলেন। এবং নিজেও একখানা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। কন্যার সুখে দুঃখে সাজানো বাড়ীখানি বায়োস্কোপের ছায়া চিত্রটীর মত তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া গেল।

কন্যার কি হইতেছিল তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না কিন্তু তাঁহার চক্ষু দিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

মহিমেরও মনটা ভারি তিক্তস্বাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কি করিলে যে কি হইতে পারে একল্পনাটাও যে তাহার মনে না উদিত হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু সকল অমঙ্গলের মূল মায়ালতাকে বিসর্জ্জন দিবার কথাটা কিছুতেই তাহার জিহ্বাগ্রে উদিত হইতে পারিল না। সে যে দুঃখিনী মায়ের একমাত্র বক্ষ রত্নকে তাঁহার বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়াছে এই শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ছিল।

বাড়ীর মধ্যে আসিয়া কহিল। মা বড় বৌকে তুমি বড় ভাল বলতে না, রকম দেখলে ত?

ক্ষেমঙ্করীরও মনটী বাঁকিয়া গিয়াছিল তাঁহার শত নিষেধ সত্ত্বেও প্রিয়বালা যে জোর করিয়া রাগ ভরে তাহার বাপের বাড়ী চলিয়া গেল এই রাগে, তাঁহার গা'টা গম্ গম্ করিতেছিল। কহিলেন। যাক্ বড়লোকের মেয়ে বাপের বাড়ীতে সুখেই থাকুক। ছেলে যদি না হ'লো তাহ'লে আমরাই কি ছেলের বিয়ে দিতাম না? মনে ক'রেছে,

তার বাপের বিষয়ের লোভে আমাদের তার সব কাজেই সায় দেওয়া উচিত, আমার ছেলে যদি বেঁচে থাকে, ওমন ঢের বিষয় হবে।

স্বজন পরিত্যক্তা মায়ালতার উপরেও মায়ের শ্রদ্ধা যেন হঠাৎ কেমন অতর্কিত ভাবে ফিরিয়া আসিল। তিনি আগেই শুনিয়াছিলেন সে দুঃখিনীর মেয়ে—তার উপরে এ অপরিচীত স্থানে তাহার একটি সঙ্গীও নাই।

সেই দিনই স্নানের বেলায় মায়ালতাকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেলেন এবং তাহার নিরাভরণ অঙ্গে তাঁহার যে কয়খানি গহ্ণা ছিল পড়াইয়া দিলেন—তারপর তাহার মায়ের সংসারেরও খবর লইলেন। একদিনেই তিনি বুঝিয়াছিলেন—মেয়েটী সুশীলা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা ব্যবহার করিয়া, বুঝিলেন—এ মেয়ের দ্বারা আর কিছু না হউক সংসারের ভারটা যে তাহার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

খোকা ত একদিনেই নববধুর বশীভূত হইয়া গিয়াছে, ছোট ছেলেদের উপরে ও দেবরদের উপরে প্রিয়বালার মত, আদৌ একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব নাই। একেবারেই নিতান্ত সহজভাবে তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যেন কতদিনকার চেনা পরিচয়, তাহারাও নববধুকে সসম্ভ্রমে তাহাদের প্রীতির আসন ছাড়িয়া দিল।

দেখিয়া শুনিয়া রাত্রের বেলায় ক্ষেমঙ্করী, অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে স্বামি যোগনাথকে কহিলেন যাই বলো কিন্তু, গরীবের ঘরের মেয়ে নইলে সংসার ক'রে সুখ নাই। এই ত এতদিন বড়বৌও ছিল। কিন্তু তার সব তাতেই যেন একটা "আলো আলো "ছাড়ো ছাড়ো" ভাব, আর এ বৌয়ের যেন সব "আপনার আপনার" ভাব, এই আজই সন্ধ্যে-বেলায় আমার পায়ে জল বুলিয়ে দিতে এ'লো। আমি বারণ কর

লাম। তবু শুনলে না. আর বড়বৌ এত দিনত ছিল পায়ে তেল দেওয়া দূরে থাক্, অসুখ বিসুখ কল্লে খোঁজ নিয়েছে? আপনার ঘর আপনার. স্বামী আর আপনার বাপের বিষয়ের দেমাক নিয়েই ছিল। তা সেবউ যদি না-ই আসে এবউ নিয়েও যে আমার সুখ হবে তা বুঝতে পাচ্চি।

যোগনাথ তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, সে আমি বরাবরই জানি ত। অভাবের সংসারে যে মেয়ে পালিত হয়েছে, সংসারের কাজে তাকে যেমনটী পাবে, বড়মানুষের আদরের দুলালীকে এ পাঁচ-টার মধ্যে কখনও তেমন পাবে না, তবে বিয়ে দিয়েছিলাম সে কেবল বড়বৌয়ের বাপের বিষয় দেখে—তা আজ যে রকম শিখরেশ্বর ব'লে গেল তাতে বিষয় পাবারও ত কোন আশা নাই, তা না পাই. এ বউএর ও মায়ের একখানা বাড়ী আছে. তা না হলেও ছেলেও ত লেখা পড়া শিখেছে, রোজগার ক'রবে। শ্বশুরের বিষয়ের আশাতেই বা কে কবে ছেলের বিয়ে দিয়ে থাকে।

এখন বৃদ্ধের নিরাশার শেষ উপায় পুত্রের ভবিষ্যৎ রোজগারের উপরেই বর্ত্তিয়াছিল।

অবশেষে অনেক রাত্রি পর্যান্ত অনেক আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইল।

এতদিন বড়বৌ যে তাহাদের বাড়ীতে ছিল সেটা দায়ে পড়িয়াই ছিল। নহিলে স্বামীর ঘর করিতে হইবে বলিয়া একটা একাগ্র অভিলাষ লইয়া এ বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। অনেক খুঁৎই তাহার বাহির হইতে লাগিল। এমন কি নাক মুখ চোখেরও খুঁৎ, এতদিন পর্য্যন্ত যাহা কাহারও চক্ষে পড়ে নাই নব বধুর তুলনায় তাহাতেও গলদ বাহির হইতে লাগিল প্রিয়বালার ব্যবহারের পর্য্যন্ত প্রতিকুল সমালোচনা বাহির হইল। তাহার উপর তাহার

পিতার বিষয় প্রাপ্তি সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ রহিয়া যাওয়াতে, সে বউ যে তাহাদের অনেক অনর্থের মূলীভূত কারণ হইয়া জুটিয়াছিল একথাটাও প্রকাশ করিতে স্বামী স্ত্রী কাহার মধ্যে—দ্বিধা বোধ হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দুই দিন আগে এই শ্বশুর এই শ্বাশুরী বড় বৌকে ধুইয়া জল খাইতেন। আর আজ ?

ঘরের কড়ি বড়গাগুলার ও একটা চেতনা থাকিলে তাহারাও বোধ হয় মানুষের এই স্বার্থের দিক চাহিয়া সত্যকে খাটো করার ব্যবস্থা দেখিয়া লজ্জায় লাল হইয়া যাইত—কিন্তু সৌভাগ্য যে সকল সময় মানুষের সকল কথা মানুষের কর্ণ গোচর হয় না, তাহা হইলে দুনিয়াটার গতি কি হইত তাহা বুঝিয়া বলা শক্ত।—হায় প্রিয়বালা ! এখন কোথায় তুমি—

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহিম ভাবিয়া দেখিল, যখন শ্বশুর মহাশয় টাকা পাঠাইবেন না তখন তাহাকে অন্য পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আইন পড়িয়া শামলা মাথায় দিয়া, দেশের গরীবের রক্ত শুষিয়া, বড় মানুষী ফলাইবার সে কল্পনাটা অনেক আগেই ত্যাগ করিয়াছিল. তবে শ্বশুর টাকা পাঠাইতেছিলেন বলিয়া পড়াটা ত্যাগ করে নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল, ব্যবসা লাইনে ইংরেজ সওদাগরদের মত সমবায় প্রণালীতে দেশ বিদেশে, ভারতবর্ষ জাত দ্রব্যের একটা একটা, বড় বড় আড়ত খুলিয়া, একই কালে তাহার নিজেরর ও দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিয়া

লইবে। তাহার জন্য খবরের কাগজেও অনেক লেখা লেখি করিয়াছিল, কিন্তু ফলটি কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। রাজা মহারাজদের কাছ হইতেও কোন সহানুভূতি পায় নাই। তবু আশাও সে ত্যাগ করে নাই। চাকরীর উপরে বরাবরই তাহার বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু উপস্থিত যে ব্যাপার দাঁড়াইল—তাহাতে চাকরী না করিয়াও তাহার নিস্তার নাই। বাড়ীর বাহির হইতে হইলে যখন পয়সা নহিলে চলা দায় হইয়া উঠে, তখন কপর্দ্দক মাত্র শূন্য হইয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে কি করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠা করিবে? গল্পে শোনা গিয়াছে বটে, অনেকে লোটা কম্বল মাত্র সম্বল করিয়া বাহির হইয়া কোটীপতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে কাল ছিল, আজ কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সহস্র প্রতিযোগীতার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তবে ভাগ্যলক্ষ্মীকে ঘরে আনিতে হইবে।

কলিকাতার কোন দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানিতে একটা সেক্রেটারীর পদ খালি আছে শুনিয়া, সেইখানে একখানা দরখাস্ত করিয়া রাখিল। এবং স্বগ্রামের স্কুলেও যাতায়াত করিতে লাগিল, সেখানকার থার্ড মাষ্টারটী তখন ছুটী লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন। গ্রামের স্কুলে যে শুধু পয়সা উপায়ই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নহে, এই সুযোগে গ্রাম সম্বন্ধে যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারে, পুষ্করিনীর পঙ্কোদ্ধার ও রাস্তা ঘাটের উন্নতি সাধন, এই আশাতেই লাগিয়াছিল। মাস খানেক চেষ্টা করিয়া দেখিল ফলও নেহাৎ মন্দ হইল না, দেশের সর্ব্ব নিম্ন স্তরেও দেশের অভাব বোধ জাগ্রত হইয়াছে, এখন শুধু তাহাদিগকে উপযুক্ত চালক দিয়া কাজে লাগাইয়া লইতে পারিলেই হইল! সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গ্রামের সকল প্রকার উন্নতির কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিল। তাহার যত্নে ও চেষ্টায়, বাউরী পাড়ায় ইতর সাধারণের শিক্ষার জন্য একটা নৈশ বিদ্যালয় ও স্থাপিত হইল।

শত কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও মহিম কিন্তু তাহার স্ত্রীর চিন্তাও পরিত্যাগ করিতে পরিলনা। প্রিয়বালা যে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এইটে তাহাকে বড় বাজিত, মা, জেঠাইমা, তাহাকে অন্যরূপ বুঝাইতে আসিতেন বটে, কিন্তু তাহা তাহার মনঃপুত হইত না। তাহার এই আক্ষেপটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইত যে, স্ত্রীকে জানাইতে পারাগেল না, কি জন্য সে এই অনাথার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিল। কত দিন তাহার জন্য প্রিয়বালাকে চিঠি লিখিতেও গিয়াছে, কিন্তু খানিক লিখিয়াই আর পত্র শেষ করিতে পারে নাই, প্রিয়বালার সহিত ওতপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত সমস্ত অতীত স্মৃতি এক মুহূর্ত্তে মানস পটে জাগ্রত হইয়া তাহাকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিয়াছে, ইহার জন্য মায়ালতার সহিত তাহার যতদূর ঘনিষ্ঠ মেলা মেশি হওয়া উচিত ছিল ততদূর হয় নাই। এক ঘরেই দুই জনে শুইত কিন্তু মহিম তক্তার উপরে থাকিত, আর ময়ালতা এক খানা মাদুর পাতিয়া মেঝেতেই শুইয়া পড়িত। মহিম যতদূর আপনাকে সম্বরণ করিয়া চলিত, মায়ালতাও ততদূর আপনাকে গোপন করিয়া দূরে দূরেই রাখিত। সেও স্বামীর কাছে গিয়া আপনার প্রথম জীবনের প্রথম অনুরাগ লইয়া একেবারেই আপনাকে, শতদলটীর মত মেলিয়া ধরিত না। যেন তাহার মধ্যেও কোথায় কি একটা কিন্তু ছিল। মহিম যদিবা এক এক দিন প্রিয়বালার স্মৃতির চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে মায়ালতার সঙ্গ চাহিত, মায়া এত দীর্ঘরাত্রির পর মায়ের পায়ে তৈল দিয়া, ঘরে আসিত যে মহিম তখন আগেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গিয়াছে।

এই রকম করিয়াই দিন যাইতেছিল। মহিমও মায়ার কাছ হইতে এ রহস্যটা আবিষ্কার করিবার কোন চেষ্টা করে নাই আর মায়াও সে

সুযোগ দেয় নাই, যেমন দিব্য সংজ্ঞে স্বামীর সহিত স্ত্রীর কথাবার্ত্তা কহা উচিত মায়া তেমনি মহিমের সহিত কথা কহিত। সংসারের নূন তেলের খবর তাহার হাতে নাই। তাহার মায়ের খবর কলিকাতার খবর, আবশ্যক কথা যে গুলা, তাহার কোনটাই বাদ পড়িত না। এবং, স্বামীর ছুটীর দিনটীও যথাসম্ভব, যতদূর তাহার সাধ্যে কুলায় রম্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। তবে কথাবার্ত্তায় ভাব ভঙ্গিমায় তাহার ভক্তিটা যতদূর প্রকাশ হইয়া পড়িত, প্রেম ততটা নহে, মহিমও তাহাই চাহিত। একবার এক জনের সহিত বাড়াবাড়ি করিয়া ঠকিয়াছিল, তাই এখন তাহারও সংযমের মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাজে কথা সেও বড় একটা চাহিত না।

কিন্তু সেদিন যখন কলিকাতা হইতে তাহার নূতন চাকরীর খবর আসল, তখন আসন্ন একটা বিরহাশঙ্কায় তাহার সমস্ত বিমুখ চিত্ত মায়া-লতার মন্দিরে ফিরিয়া আসিল। ভাবিল তাইত, এতদিন মায়ালতাকে, না বুঝিয়া ত বড় অন্যায় করিয়াছি, বালিকা কি লইয়া এই দীর্ঘ দিন-রাত্রি গুলা কাটাইয়া দিবে? দিনমানটা হয়ত কাজের ভিড়ে ও সংসার কোলাহলে একরকমে কাটাইতে পারিবে। কিন্তু সঙ্গহীন দীর্ঘরাত্রি-গুলা যখন করালবদন ব্যাদন করিয়া, অন্তহীন ভবিষ্যতের এক অপরূপ মায়াচক্র নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার কাছে, সমস্ত জীবনের বুভূক্ষা নিবে-দন করিতে আসিবে, তখন বালিকা কি লইয়া, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে—বক্ষ নিঙাড়িয়াও যে এক বিন্দু রক্ত বাহির হইবে না!

সন্ধ্যাবেলায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মায়ালতাকে ডাকিয়া কহিল। শুনেছ ত ক'লকাতায় চাকরী হয়েছে, দু চার দিনের মধ্যেই যাবো, আমি চলে গেলে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

কষ্ট হইবে কি না সে কথা, মায়ালতার পক্ষে খুলিয়া বলা দুঃসাধ্য,

এই যে প্রতিদিন স্বামীকে দেখার সুখ, সে সুখটীও ত তাহার মিলিবে না, তাহার চক্ষু ছল ছল প্রায় হইয়া আসিল। মহিম সস্নেহে, মায়ার কটিটী ধরিয়া কহিল, ক'লকাতায় তোমার মায়ের কাছেও প্রায়ই যাবো, আর চিঠিতে তোমার মায়ের খবরও লিখবো। মায়ের কথায় মায়ার আর ধৈর্য্য রহিল না—ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, অনেক দয়াই ত ক'রেছেন। মাকে এক একদিন দেখতে যাবেন, আপনি ছাড়া মায়ের আর কেউ নাই।

মহিম আহত হইয়া কহিল। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। পারিত তোমাকেও একবার না হয়—নিয়ে যাবো।

মায়া সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল বেশ। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া মহিম কহিল!—কিন্তু মায়া, তোমারও একটা ভুল হ'য়েছে, এতদিন কাছেই ত ছিলে, তবু আমার কাছে আসতে না কেন? আমিই না হয় দূরে থাকতাম। তোমার ত আমায় চেতাইয়া দেওয়া উচিত ছিল!—মায়া কণ্ঠের ব্যাথাটী সামলাইয়া কহিল তাই কি ঠিক?

মহিম কহিল। কেন ঠিক নয়?

মায়া কহিল, দিদির পরে, তবে আমার স্থান ত, সেই দিদি যে অভিমান ভরে চ'লে গেল; আপনি তারপর আর তাঁর কোন খোজ নিয়েছেন?—

মহিম কহিল। যদি কেউ কথা না বুঝে চ'লে যায় তাতে দোষ কার?

মায়া কহিল। মেয়ে মানুষে আর পুরুষ মানুষে সমান কি? মেয়ে মানুষ ত সহজেই অবলা জাতি, কত ভুল করে; ভুলটা পুরুষে না শোধরালে কে শোধরাবে? কে বুঝবে তাকে?

মায়া যে বুদ্ধিমতী মহিম তাহা জানিত, কিন্তু এতদূর বোধের কথা,

চিন্তাও করে নাই, আবেগ বিহ্বল হৃদয়ে মায়াকে, বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, একটা চুম্বন দিয়া কহিল। মায়া একথা ঠিক। আমিও তা বুঝেছি, তাকে পত্র লিখবো কিন্তু তোমার হৃদয়টা যে এত মধুভরা আমি তা থেকেও বঞ্চিত থাকি কেন?

মায়া মহিমের বাহুপাশ কাটাইয়া কহিল। বঞ্চিত থাকবেনই যতদিন না দিদিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন, আমি মিনতি কচ্চি, ততদিন আমাকেও ভালবাসবেন না।

মহিম বিস্মিত হইয়া, মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই ত্যাগ সুন্দর শুভ্র হৃদয়টার দিকে চাহিয়া সত্যই তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উদ্বেল কণ্ঠে কহিল মায়া, এই বিসর্জ্জনই তোমাকে প্রতিষ্ঠার আসন দেবে, তুমি সুন্দর মহিমান্বিতই থাকবে ফুলশয্যার রাত্রে তোমার এক মূর্ত্তি দেখেছিলাম আবার আজ তোমার আর এক মূর্ত্তি দেখছি। চমৎকার একটা সামঞ্জস্য আছে, বলিতে বলিতে তাহার স্বর আর এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে পৌঁছিল!—তাহার ভিতরকার সুপ্ত আবেগটাকে, কে যেন তীব্র ভাবেই নাড়া দিয়া দিল। দুই ব্যগ্র বাহুতে, মায়াকে বেষ্টন করিয়া অজস্র চুম্বন দিয়া কহিল। জীবনে আর যদিও কিছু না পাই, তবে এই নারী রত্নই আমার সমস্ত জীবনের গর্ব্ব হয়ে থাকবে, আমি বুঝবো রাজ্যেশ্বরের সিংহাসনও আমার সিংহাসনের উপরে নয়। বিদায়ের আগেকার সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সহিত নূতন পরিচয়ে অপূর্ব্ব রম্য হইয়া কাটিয়া গেল। দীর্ঘ প্রবাসের পথে এই স্ত্রী, তাহারও শূন্য মনের একটা অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তির সামগ্রী হইয়া রহিল।

যাত্রাকালে মা ক্ষেমঙ্করীকে ডাকিয়া কহিল। দেখ মা, তুমি ভিন্ন নতুন বৌএর আর কেউ নাই। তুমি তাকে সন্তানের মতই শ্রদ্ধা

ক'রো, সেও তার প্রাণ দিয়ে তোমার সেবা ক'রতে কুণ্ঠিত হবে না। গরীবের মেয়ে টাকা কড়ির কাঙ্গাল নয়, একটু শ্রদ্ধারই কাঙ্গাল।

মাও পুত্রের মন বুঝিতেন, কহিলেন না বাবা, আমারও অশ্রদ্ধার কিছু নাই। আমি ছেলেদের মতই নতুন বৌকে দেখি, বড় বৌ বরং আমার শ্রদ্ধার তোয়াক্কা রাখতো না, কিন্তু এবউ আমার খুব বাধ্য।

আজ মহিমের যতটুকুই আনন্দ, তৃপ্তি ও শান্তি বোধ হইতেছিল। প্রিয়বালার জন্য আবার ততটুকুই দুঃখ ও বেদনা বোধ হইতে লাগিল—ভাবিতে লাগিল—হায় নারী প্রিয়বালা!

তাহার সবই ত ছিল। চেষ্টা করিলে তাহার সবই ত থাকিতে পারিত, কিন্তু স্বেচ্ছায় জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটাকে কেন অন্যায় করিয়া দ্বেষ দিয়া হিংসা দিয়া মরু করিয়া চলিয়া গেল। এখন হয়ত রিষের জ্বালায় কথাটা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু সাল তামামির দিনে যেদিন বুঝিবে তার জীবনের জমাই বা কত খরচই বা কত! তখন ভবিষ্যতের গাঢ় শূন্যতার পানে চাহিয়া নারী অস্থির হইয়া উঠিবে। কিন্তু তখন আর কোন উপায়ই নাই। মর্ম্ম ছিঁড়িয়াও একবিন্দু রক্ত নাই, মহিম স্থির করিল। "জরুর" প্রিয়বালাকে একখানা পত্র লিখিতে হইবে। কিম্বা নিজেই তাহাকে যাইতে হইবে।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাপের ঘরে আসিয়া প্রিয়বালা মনে করিয়াছিল সে তাহার পূজা অর্চ্চনা ব্রত আদি লইয়া সমস্ত অতীত স্মৃতি হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে সরাইয়া লইবে, কিন্তু এযে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যে মায়ের

ঘরে আসিয়া, যে মায়ের গলা জড়াইয়া সে কেবল বিহ্বলার মত স্বামীর কথা স্বামীর ভালবাসার কথা কহিয়া গিয়াছে, সে ঘরে আজ কেমন করিয়া ব্রতধারিণী হইয়া কাটাইবে? স্বামীর সামান্য একটা প্রশংসার কথা বলিতে মাকে যাহার এতটুকু বাধে নাই, কবে কোন দিন স্বামী তাহার জন্য গোপন করিয়া, নিজের জলপানের পয়সা বাঁচাইয়া, দুটা এসেন্স, দুটো বাসতৈল আনিয়াছিল সে কথাটাও জাঁক করিয়া বলিতে যাহার বাদ পড়ে নাই—সেই মায়ের কাছে কেমন করিয়া বলিবে "ওগো মা আজ সর্ব্বস্ব হারাইয়া তোমার দুয়ারে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি আজ আর আমার স্বামীও আমার নাই। স্বামীর ঘরেও আশ্রয় নাই!

প্রথম দিনটা শুধু কাঁদিয়া, মায়ের বক্ষে মাথা লুকাইয়া অশ্রু বর্ষণ করিয়া কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিনে সে শক্ত হইয়া পড়িল। বিশেষ প্রতিবেশী বাল্য সঙ্গিনীদের কৌতুহল দৃষ্টি তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া পড়িল। যে বাল্য সঙ্গিনীরা তাহার স্বামীর অগাধ ভালবাসায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, ঈর্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গিনীরা তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়া—মনে মনে খুসী হইয়া চলিয়া যাইবে, এইটেই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া বাজিল।

মাকে কহিল যতক্ষণ না আমার পূজা শেষ হয় ততক্ষণ কেহ যেন আমার বন্ধ দুয়ারে আসিয়া না আঘাত করে।

মাও বুঝিয়া সকলকে নিবারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু একি হইল প্রিয়বালার—পূজাতেও যে মন স্থির হয় না। সেই যে স্বামী মহিমা-রঞ্জন রাত্রের বেলায় দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিয়াছিল—"আগে বোঝো, তারপর আমায় দুষো" সেই কথাটী যে কেবলি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনোরাজ্যের উপর গোপ্তা লাগান ঘুড়িটীর মত পাক খাইয়া

যাইতে লাগিল। দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইয়া, সে অঞ্জলি যে কোথায় পড়ে তাহা তাহার অন্তরাত্মার কাছে ছাপা থাকে না। দীর্ঘ দিনরাত্রির সমস্ত পূজা প্রচেষ্টার উপরে সেই এক বাণী সেই এক স্মৃতি ছাড়া তাহার আর কিছু নাই। চিত্তটাকে যতই উন্মুখ করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করিবার প্রয়াস পায়—চিত্তটাও তত বিমুখ হইয়া তাহার অন্তর প্রদেশ খনন করিয়া রক্ত তুলিতে থাকে, সবলে বিসর্জ্জন দিতে যাইয়া আবার সেই স্মৃতিই নিবিড় ভাবে গ্রহণ করিয়া লইতে হয়। আগে হইতে সে বুঝিয়াছিল স্বামী কি জিনিষ। কিন্তু এমন যে হৃদয়-জোড়া তাহা অনুভব করে নাই।

তাহা হইলে বোধ হয় চলিয়া আসিত না। কিন্তু আর যে ফিরিয়া যাইবারও সেমুখ রাখে নাই। একদিন ব্যাকুল হইয়া দেবতার দোরে লুটাইয়া কহিল। ঠাকুর আর কেন দুঃখ দাও! জীবনের সুখ আশা সবইত আগুণে আহুতি দিয়ে এসেছি! এখন শূন্য হৃদয়টী তোমার প্রেমে ভরিয়ে নাও!' ভক্তি দাও! ওগো দয়াল ভক্তি দাও! কিন্তু তাহার সব প্রার্থনাই যেন পাষাণে প্রতিহত হইয়াই ফিরিয়া গেল!

আপনার সহিত যুদ্ধে সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় দরদালানের চৌকাঠে মাতা স্নেহময়ীর পায়ের কাছটাতে একটা সিঁড়ির নিম্নে বসিয়াছিল। আকাশে প্রথম শারদাকাশের চাঁদ উঠিয়াছিল। আর সেই চাঁদের আলোকে বিশ্ব ভুবন ছাইয়া গিয়াছিল!

প্রিয় মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল। মা আমায় যদি একটু বিষ এনে দিতে পার্ত্তে, বড্ড ভাল হ'তো।

মা আহত হইয়া কহিলেন ওকথা কি ব'লতে আছে প্রিয়? ষাট্ বেঁচে থাকো।

প্রিয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল। না মা আমার বেঁচে থাকার সুখ কি?

একটা যদি ছেলেও থাকতো তবু না হয় বাঁচতে পার্ত্তাম। কিন্তু এই রকম এই শূন্য জীবনটা ব'হে বেড়াবার কি দরকার ?

মাতার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া গেল। এ ব্যাথায় সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহারও সাধ্যের অতীত ছিল। কহিলেন সুখ নাই ব'লে কে ম'রতে চায় মা ? কতজনা যে গাছতলাতেও প'ড়ে বুড়ো হ'য়ে যাচ্চে ! ওকথা ব'লতে নাই প্রিয়—আত্মা পুরুষ নারায়ণ।

প্রিয় পুনরপি ঘাড় নাড়িয়া কহিল। না মা তবু মরা উচিত ! যে জীবনে কোন উদ্দেশ্য নাই কোন সুখ নাই—সে জীবন নষ্ট ক'রলেও বোধ হয় কোন পাপ নাই ! বেঁচে থেকে খানিকটা জায়গা জোড়া বৈত আর কিছু নয় !

মাতা অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন—সে দিনকার মেয়ে—তুই—প্রিয় তোর এত শত ভাবা কি ভাল দেখায় ? চল্ আমায় একটু রামায়ণ প'ড়ে শোনাবি !

প্রিয় শূন্যে দুই হাত মর্দ্দিত করিয়া উদাস স্বরে কহিল। আর প'ড়বো কি মা, পড়া সব ভুলে গেছি।

মাতা স্নেহময়ী সব বুঝিতেছিলেন, শুধু কন্যারই ব্যথার ভয়ে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন না। আজ যখন প্রিয়বালা আপনা হইতে কথাটা পাড়িল তখন ছাড়িলেন না। আবার কন্যাকে শ্বশুর গৃহ পাঠাইবার জন্য যে কথাটী মনে মনে জাগিত, তাহারই সূচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

প্রিয়র খোলা চুলগুলা দুইহাতে জড়াইয়া দিতে দিতে কহিলেন। আচ্ছা প্রিয় তোর শ্বশুরটী ত মন্দ লোক না—।

প্রিয় নিতান্ত সহজ স্বরে কহিল। উঁহু কেউ মন্দ নয় মা, আমার অদৃষ্টই মন্দ।

স্নেহময়ী কহিলেন। বেহাই কর্ত্তাকে একখানা পত্র দিয়েছে, জানিস্?

প্রিয় কহিল জানি বৈকি। তোমাদের ঘরে ঠাঁই না হ'লে বাধ্য হ'য়েই দাঁতে কুটো কেটে, আমার সেই ঘরই ক'রতে যেতে হবে।

স্নেহময়ী ভাব বুঝিয়া, কথাটা অন্য দিকে ফিরাইয়া কহিলেন। না তা বলিনি, কেই বা যেতে ব'লছে? কিন্তু ছাখ্ প্রিয় তোর সতীন-টাও কিন্তু মন্দ হবে না হয়ত। গরীবের ঘরের মেয়ে হোক্ বোধ শোধ আছে. ও পাড়াকার অষ্টমা বান্দী ওবার দিয়ে কোথায় গিয়েছিল, তার বোনের বাড়া না মাসীর বাড়ী, ফেরবার সময় তোর শ্বশুর বাড়ী দিয়ে এসেছিল। আমায় বল্লে, তোর সতীন যে,—সে দিদি দিদি ক'রে কত তোর খোজ নিয়েছে, তোকে যাবার জন্যও মিনতি করে কত বলে দিয়েছে, অষ্টমার মুখেই তু সব শুনবি, এখন। আচ্ছা তুই সে সতীনের সঙ্গে একটা কথাবার্ত্তা কয়েছিলি?

সতীনের নামেই তাহার গাটা কেমন জ্বালা করিতে থাকিত; তাহার উপর মা শুদ্ধ যখন সেই সতীনের সুখ্যাতি করিয়া কথাটা তুলিল। তখন সে না জ্বলিয়া পারিল না. নহিলে কথাটায় মন্দ কিছুই ছিল না।

প্রিয় জ্বলিয়া কহিল। মু'র ছি সে পোড়াকপালী সুন্দরী রূপসী ব'লে নাকি? তোমরা আনতে গেলে তাই, নইলে তার সঙ্গে একবার ভাল ক'রেই কথা কইতাম, ভাল একখানা চক চ'কে ছুড়ি তার বুকে বসিয়ে দিয়ে তারপর বুঝেছ! ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, আমার ত মরণে কিছু ভয় ছিল না।

স্নেহময়ী কহিলেন,—দূঃ পাগলী। জামাই ত শুনতে পাই, দায়ে পড়েই তাকে বিবাহ ক'রেছিল। গরিবের জাত রক্ষা হয় না ব'লে।

প্রিয় ঝাঁঝি দিয়া কহিল। শোন কেন মা? ওসব রচা কথা

মাত্র। কি ব'লবে তাই এইটে প্রচার ক'রেছে। আসলে তোমার জামাই-ই ষোল আনা দোষী।

মা খানিক চুপ চাপে থাকিয়া কহিলেন,—"কিন্তু এই জামাই ত তোকে খুব ভালবাসতেন প্রিয়। ধূয়ে জল খেতো—

প্রিয় এক মুহূর্ত্তে সজাগ হইয়া খাড়া হইয়া কহিল মা, ফের ঐ কথা, আবার তার নাম কচ্চো? আবার সেই কথা মনে পাড়িয়ে দিচ্চো? বলিতে বলিতে তাহার বড় বড় চক্ষু দুটী হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িয়া গেল। ছুটিয়া আপনার অন্ধকার ঘরের বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল!

স্নেহময়ী বুঝিলেন। এখনও প্রিয়র হৃদয়ে তাহার স্বামীর স্মৃতি—তেমনি উজ্জ্বল তেমনি প্রবল রহিয়াছে, যন্ত্রণায় শুধু ছাই চাপা দিয়া বুকের আগুন চাপিয়া রাখিতেছে মাত্র। ভাবিলেন কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে। বলিতে হইবে বাপের ঘরে স্বর্ণ সিংহাসনেও যাহা নাই, স্বামীর দৈন্য মলিন পর্ণ কুটীরেও তাহা আছে, সে দৈন্যই বলো, দুর্গতিই বলো, তাহাই নারীর পরম অবলম্বন! আরও তাহাকে জানাইতে হইবে! নারীর মুক্তিও সেই তীর্থ ক্ষেত্রে, সেই ভক্তির ক্ষেত্রে, যেখানে সে সব খোয়াইয়া নিঃসঙ্কোচে বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, আমি "রিক্ত হইয়া ধন্য হ'লাম!"—বলিতে হইবে, যদি শ্রেয়ঃ চাও গতি চাও, সেই স্বামীর ঘরেই ফিরিয়া যাও। সেখানে তোমার সাম্রাজ্ঞীর আসনই পাতা আছে!

স্নেহময়ী উঠিয়া যাইতেছেন। এমন সময় ঝী সৌদামিনী প্রিয়-বালার নামীয় একখানা চিঠি লইয়া আসিয়া স্নেহময়ীর হাতে দিয়া কহিল। গঞ্জ হ'তে চাকরটা এইমাত্র নিয়ে এলো, বোধ হয় জামাই বাবুই লিখে থাকবেন।

স্নেহময়ীও জামাইএর হস্তাক্ষর চিনিতেন। চিঠিখানা সাগ্রহে লইয়া

প্রিয়বালার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রিয়বালার অলক্ষ্যে প্রিয়বালাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে চিঠিখানা তাহার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।

স্নেহময়ী যখন চিঠিখানা অঞ্চলে বাঁধিয়া দেন তখনই প্রিয়বালা মায়ের গোপন কার্য্যটী ধরিতে পারিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ করিয়া রহস্যটী ভঙ্গ করে নাই। সেও ঠিক করিয়াছিল যে এ পত্র তাহার স্বামীই লিখিয়াছে, ঘরের কবাটটা বন্ধ করিয়া বাতি জ্বালাইয়া সাবধানে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল! প্রথমেই সেই চিরপরিচিত সম্বোধনে লিখিয়াছেন,—

"প্রাণের প্রিয় !

তুমি আমায় ভুলিতে পারিয়াছ, কিন্তু আমি তোমায় পারি নাই। তুমি আমার সেই প্রিয়ই আছো!" অনেকখানি ভূমিকার পর লিখিয়াছেন যদি জানিতে, কি জন্য, আমি এক অনাথার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা হইলে দোষ লইতে না। পাষাণে পূজা করিয়া, মনটাকেও যদি, না পাষাণে গড়িয়া থাকো, মানুষের সুখ দুঃখের সহিত যদি তোমারও হৃদয়ের সুখ দুঃখ কখনও স্পন্দিত হইয়া থাকে, তবে তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে এ বিবাহ আমার দোষের হয় নাই। তেমন অবস্থায় পড়িলে তুমি নিজেই হয় ত আমার এ বিবাহের আয়োজন করিয়া দিতে। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, তোমার মনেই বেদনা দিতে এ বিবাহ করি নাই। তাহা যদি করিয়া থাকি, কি রূপ দেখিয়া মজিয়া থাকি, তবে ভগবানের দণ্ড আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রিয়! শুদ্ধ ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসিয়া মানুষের দুঃখ, দৈন্যের পূজা করিয়া, আজ আমায় এই শাস্তি বহন করিতে হইতেছে।

আবার পুনশ্চ করিয়া সতীনেরও একটু পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন, 'এই মায়ালতাটীও অদ্ভুত এক প্রহেলিকা' যে মায়ালতার জন্য, তোমার প্রেম তোমার ভক্তি হইতেও আমাকে বঞ্চিত হইতে হইল। সেই মায়ালতা বলেন কিনা, দিদিকে, অর্থাৎ তোমাকে, ফিরাইয়া না আনিতে পারিলে তাহার কাছেও আমার স্থান নাই। একবার যদি কেবল আসিয়া, তাহার সহিত আলাপ পরিচয়টাও করিয়া যাও, তাহা হইলে আমার বোধ হয় তোমার অনেকটা সন্দেহই দূরীভূত হইয়া যাইবে। ইত্যাদি—

প্রিয় একবার, দুইবার, সারারাত ধরিয়া পত্রখানা পড়িল। কিন্তু কেমন যে মানুষের মন,—সকাল বেলায় উঠিয়া তাহার মনে হইল যেন সে সারারাত, কেবল একটা সোণার স্বপ্নের সহিতই লুকোচুরি খেলিয়াছে, নহিলে পত্রখানার মধ্যে বাস্তবিক বাস্তবতা কিছুই ছিল না। কেবল শুধু ছায়ার মত একটী কথা তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া রহিল যে, তাহার স্বামী মানুষকে ভালবাসে, এবং সেই ভালবাসাতে মজিয়া প্রিয়-লতাকে পায়ে ঠেলিয়া আসিয়াছে।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজার সময় প্রিয়বালার এক খুড়তুতো বোন নাম নৃপবালা শ্বশুর গৃহ হইতে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়াছিল।

প্রিয় তাহারই এক বৎসরের ছোট ছেলেটীকে কোলে করিয়া, তাহার অনাগত পিতার উদ্দেশ্যে নিতান্ত রুচিবিগর্হিত ভাষায় বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতেছিল। নিতান্তই অকারণে কথাগুলা তাহার মুখ

দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু প্রিয়বালা থামিতেও পারিতেছিল না। শূন্যের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া শূন্যের উপরে ঝালটা ঝাড়িয়া, যেন তাহারও মধ্যে কতকটা সান্ত্বনার বিষয় আছে। তাই শিশুর মা, নৃপবালা, মাঝে মাঝে তাহার দিদির রকম দেখিয়া হাসিয়া সারা হইয়া যাইতেছিল, এবং বলিতেছিল।,— দিদি যদি কথাগুলা মহিমবাবুকে শোনাইতে পারিতে, ত কাজে লাগিয়া যাইত।

সহসা দুই বাহুর দ্বারা শিশুকে বক্ষে চাপিয়া প্রিয়বালা কহিল,— নৃপ, তোর এই ছেলেটীকে দিবি, আমি একে বুকে ক'রে আমার খালি বুকটী ভরিয়ে নেব।

নৃপ হাসিয়া কহিল,—দিব, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আহা দিদি আজ যদি তোমার কোলে ওমনি ছেলেও একটী থাকতো তবে কি সুখের না হতো।

প্রিয় শিশুর গণ্ডে একটী স্নেহভরা চুম্বন দিয়া কহিল,--"কেন এই যে এই আমার ছেলে!" নয় কি? অজস্রই চুম্বন করিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় বাহিরে এক বৈষ্ণবী "হরে কৃষ্ণ হরে জয় হোক মা," বলিয়া ভিক্ষা লইতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং প্রিয়বালার দিকে চাহিয়া কহিল। এই যে বউমা, তুমি এখানে রয়েছ?

প্রিয় বৈষ্ণবীকে চিনিত,—"কহিল হাঁা।"

নৃপ দিদিকে টিপিয়া কহিল,—"কোথাকার ও বৈষ্ণবী দিদি তুমি কি ক'রে চিন্‌লে?"

প্রিয়বালাকে আর উত্তর দিতে হইল না।

বৈষ্ণবীই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ একমুখ হাসিয়া কহিল,—"মা আমি ওর

শ্বশুর বাড়ীর দেশের আখড়াতেই থাকি। এখানকার আখড়াতেও মাঝে মাঝে এসে থাকি উনি যে আমাদের মুক্তাগাছার বাবুদের বাড়ীর বৌ-মা। এই পরশুই সেখান হতে আস্‌ছি।

শ্বশুর বাড়ীর কথায় প্রিয়বালার মুখটী শুষ্ক হইয়া আসিল, ভাবিল পাছে নৃপবালা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। হইলও তাহাই নৃপবালা বৈষ্ণবীকে কহিল,—"হ্যাঁ গা তোমাদের মুক্তাগাছার বাবুরা সব ভাল আছেন।"

বৈষ্ণবী কহিল,—"আছেন বৈকি। সে দিন যে যোগনাথ বাবুর বাড়ীতে একটা "ভুজনো" হয়ে গেল। যোগনাথ বাবুর বড় ছেলের একটী ছেলে হ'য়েছিল তাই। আহা ছেলে নয় ত যেন রাজ পুত্তুর! কে বল্‌বে সাত আট মাসের ছেলে. আমরা দেখেছি মা, লোকজন খাইয়েছেনও রেশ্‌।"

প্রিয়বালার বুঝিতে বাকি রহিল না,—কাহার পুত্র হইয়াছে; কিন্তু এ সংবাদ সে পায় নাই, খানিক শুদ্ধভাবে বৈষ্ণবীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর ভিক্ষার চাউল আনিতে বাড়ীর দিকে উঠিয়া গেল।

নৃপবালা কহিল,—"ও মা, ছেলে হ'য়েছে, কৈ তা ত দিদি বলে নাই। দিদিও বোধ হয় সে খবর পায় নাই।

বৈষ্ণবীকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল,—"ছেলের বাবাকে দেখেছ? নাম মহিম বাবু।"

বৈষ্ণবী যদিও মহিম বলিয়া কোন বাবুকেই চিনিত না, তবু অসঙ্কোচে কহিল,—"হঁা মা তাঁকে আবার জানি না, তাঁকে ত এ দেশের সবাই জানে, সুন্দর রকম দোহারাগোচ বাবু?"

নৃপবালা কহিল,—"হঁা, ছেলের মাকে দেখেছ?"

বৈষ্ণবী কহিল,—"দেখেছি বৈ কি, আহা যেন পরীর মত মেয়ে,

শুনেছি, তাঁর একটী সতীনও আছে। তাতে কি আসে যায়, সোণারচাঁদ যদি বুকে ধরা দিলে।

তখন নৃপবালা বুঝিল, বৈষ্ণবী ভিখারীর মেয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিতে যাইয়া, যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নজরে পড়ে, তাহাকেই মুখের চেনা চিনিয়া আইসে, পরিচয় লইবার এত সুযোগ তাহার কোথায়? সেও আর বৈষ্ণবীর কাছে আসল রহস্যটা ভাঙ্গিল না। কহিল মাঝে মাঝে এসে খবর দিয়ে যেও।

বৈষ্ণবী বিস্ফারিতনেত্রে কহিল,—"আসবো বৈকি মা! অবশ্য আসবো। তোমাদের দয়াতেই ত আমরা বেঁচে আছি।

প্রিয়বালা আসিয়া বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিয়া বিদায় দিয়া দিল।

নৃপবালা প্রিয়বালার দিকে, চাহিয়া স্মিতদৃষ্টিতে কহিল,—"এইবার দিদি খাওয়াও। এই ছেলে ছেলে ক'র্‌ছিলে ছেলে ত তোমার হ'লো।

প্রিয়বালা কহিল,—"বকিস্ কেন? ও বৈষ্ণবীর মেয়ে ত সব জানে! কোথায় কি শুনেছে তার ঠিকানা নাই—দুটো ভিক্ষে নিতে হবে,—তাই ব'লে চ'লে গেল। অমন ওরা বল্লে থাকে।

নৃপবালা কহিল,—"না দিদি, আমি সব খবরই নিয়েছি, সে ছেলের মায়ের—সতীন আছে পর্য্যন্ত ব'ল্লে, তখন কি মিথ্যে হবার যো আছে। তবে তোমাকে হয় ত ঠিক কার বউটী তা চেনে না, হ'তে পারে, কিন্তু ছেলে নিশ্চয় হয়েছে।

প্রিয়বালা কহিল,—"দূর্, তাহ'লে আমরা ত শুনতে পেতাম।

নৃপবালা কহিল,—"শোনবার চেষ্টা করেছ কি? তা হ'লে শুনতে পেতে।"

প্রিয়বালা কথাটাকে অবিশ্বাস্য মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা

করিতেছিল ; কিন্তু স্ত্রীলোকের কি যে একটা "মা" শুনিবার "মা" হই-বার উগ্র কামনা, প্রিয়বালা সে কথাটী উড়াইয়া দিতে গিয়াও পারিল না। নৃপবালার সহিত চোকের জল ফেলিয়া স্বীকার করিতেই হইল। তাহার সতীনের পুত্র হইয়াছে, আর সে পুত্রের আংশিক দাবীও তাহার আছে, গর্ভে না ধরুক, সে তাহার স্বামীরই পুত্র এবং সেই পুত্রই তাঁহার পিণ্ডের মালিক। তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়টা সহসা যেন অপূর্ব্ব এক রণণে ভরিয়া উঠিল। নৃপবালার পুত্রটীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, এমনিই ত সুকুমার! এমনিই ত শুভ্র শিশু! গর্ভে না ধরিলেও তবু তাহাকে বক্ষে লইয়া শান্তি আছে, তাহার মুখ হইতে মা শুনিয়া তৃপ্তি আছে।

প্রিয়বালার হৃদয়মধ্যে আবার যেন একটা দহন আরম্ভ হইল!—দিনের পর দিন জীবনের সুখ সাধ গুলি নিরাশার যজ্ঞে আহুতি দিয়া, সম্প্রতি যে একটু নীরব সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল, সেটা আবার যেন একটা প্রবল ভূকম্পে নড়িয়া উঠিল। আজ আবার তাহার পূজায় মন বসিল না। সে দিন ছিল যখন স্বামীই মাত্র তাহার আকাঙ্ক্ষার ? আজ আর স্বামীর স্থান নাই। সমস্ত বিশ্ব ভুবন সেই এক শিশুর হাসিতেই ভরিয়া গিয়াছে, আর সেই শিশু হাত বাড়াইয়া যেন তাহার বুকের কাছে আসিতে চাহিতেছে। কিন্তু এমনি হতভাগিনী প্রিয়বালা, ক্ষুদ্র একটা গণ্ডী পার হইয়া শিশুটীকে বক্ষে তুলিয়া, তাহার রক্তগণ্ডে একটা চুমা দিবার সে সাধ্যও তাহার নাই। তবু কোন রকমে লোক দেখানো গোছ পূজাটা সারিয়া বাহিরে আসিয়া বসিল, রামায়ণটী হাতে করিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ঝী সৌদামিনী একই কালে দুই খানা পত্র প্রিয়বালার হাতে দিয়া গেল!

দূর গঞ্জে পোষ্টাফিস্ বলিয়া, পিয়ন মহাশয় এক সঙ্গেই দুই বিটের চিঠি বিলি করিয়া থাকেন।

প্রথম পত্র খানা খুলিয়া দেখিল, প্রথম খানা তাহার শ্বাশুড়ী লিখিয়াছে, দ্বিতীয় খানা তাহার স্বামী ও তাহারই এক অংশে, তাহার সতীন অন্তিম মিনতি জানাইয়া কম্পিত হস্তে দুই ছত্র লিখিয়া দিয়াছে লিখিয়াছে দিদি আমার দিন ফুরাইয়াছে, তোমার সংসার তোমার পুত্র, আসিয়া বুঝিয়া লও, আমার কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে।

সকল চিঠি গুলারই এই একই মর্ম্ম দাঁড়াইল যে, তুমি এসো সংসারে তোমার আসন খালি পড়িয়া রহিয়াছে, নব বধূর ভরসা আর নাই, কারণ সে প্রসবান্তে সূতিকা রোগে পড়িয়াছে।

চিঠি দুখানা প্রিয়বালা মা স্নেহময়ীর হাতে দিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, ব'লো ত মা কি করা যায়? যা'দিকে ছেড়ে এসেছি, তাদের এ অন্যায় রকম 'আব্দার' কেন বাবু! বলিয়া মায়ের অনুমতি অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মা চিঠি দুখানায় একবার চোক বুলাইয়া কহিলেন,—তাই ত, এযে দেখছি যাওয়াই উচিত।

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ লোক, এক খানা পত্র লইয়া ও মুক্তগাছার সংবাদ লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মায়ালতার সুতিকা রোগ শুনিয়া ইতি পূর্ব্বেই স্নেহময়ীর মত হইয়াছিল। লোক আসাতে কন্যা পাঠাইতে কোন অমত রহিল না।

প্রিয় কহিল, তবে না হয় বাবাকে না জানিয়ে, এই খানকার পাল্কী বেহারা করে যাওয়া যাক, একটী দিনের মত থেকে তারপর চলে আসা যাবে!

স্নেহময়ী কহিলেন তাই কি হয়? আমি কর্ত্তার মত করিয়ে আনছি, শ্বশুর বাড়ী কি অমনি অমনি যেতে আছে, বলিয়া তিনি কর্ত্তার কাছে অনুমতি চাহিতে গেলেন।

প্রিয়বালা লোকটীকে ডাকিয়া, গোপনে শ্বশুর বাড়ীর সকল সংবাদই জানিয়া লইল। স্বামী সতীন সতীন পুত্র, এমন কি শ্বশুর দেবর পর্য্যন্ত সকলকার সংবাদই খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

তিন বৎসরের পর শ্বশুর বাড়ী যাইবে, তাও দু এক দিনের মত। প্রিয়বালার কোন আয়োজন ছিলনা, গহনা পত্র বেনারসী সাড়ী তাহার ট্রাঙ্কেই পড়িয়া রহিল। এমন কি মাথাটী পর্য্যন্ত বাঁধিল না, আলতা দিয়া পাও কামাইল না। মার চক্ষে কি তাহা সহ্য হয়, ভাল করিয়া কন্যার শ্বশুর বাড়ী যাত্রার সকল আয়োজনই যোগাড় করিয়া দিলেন। সতীন পোর জন্য জামা কাপড় মহিমরঞ্জনের জন্য ভাল সন্দেশ পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিলেন। এবং সমস্ত রাত্রিটী ধরিয়া কন্যাকে মাজিয়া ঘসিয়া মুখ মোছাইয়া পা কামাইয়া যথাযোগ্য, স্বামীগৃহ বাসের যোগ্য করিয়া সাজাইয়া তুলিলেন। কন্যা কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝিতেছিল এবার ত আর সে সাম্রাজ্ঞীর আসনে বসিতে যাইতেছে না এবার সে যে নিজেই ভিক্ষু হইয়া চলিয়াছে, “পথ বিজন তিমির সঘন” দিয়া,—সকাল বেলা সামান্য এক খানা কাপড় পড়িয়া গিয়া, পাল্কীতে উঠিল!

মা কহিলেন, সে কি প্রিয়!—এক খানা গহনাও পড়লি না?

প্রিয় কহিল,—না মা এই ভাল, এবার ত আর সুখের যাত্রা নয়, চলেছি যে দুঃখের অভিসারে—

বেহারারা হুম হুম করিয়া পাল্কী লইয়া যাইতে লাগিল, আর সেই শব্দের তালে তালে তাহার সমস্ত অতীতটী যেন, এক মুহূর্ত্তে চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। প্রিয়বালা বহু চেষ্টা করিয়াও সে স্মৃতির হাত এড়াইতে পারিল না, মনে পড়িতে লাগিল।

তিন বৎসর আগে সংসারের যে ভাঙন ধরা উপকূল হইতে পতনের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বেই সরিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই ভাঙন ধরা

উপকূলেই ফিরিয়া যাইতেছে। তখন ছিল রাগ অভিমান। যৌবনের জ্বালাময় মধ্যাহ্নের একটা উষ্মাময় আত্মবিস্মৃতি। আর আজ তাহার কিছুই নাই, সে রাগও নাই, সে গর্ব্বও নাই! চলিয়াছে, চলিয়াছে, দু'রু দু'রু হৃদয়টা লইয়া সেই পথে!—

প্রিয় পাল্কীর দ্বার বন্ধ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, ঠাকুর বল দাও। শক্তি দাও! তোমার সব ব্যথা সব অপমান সহিতে শক্তি দাও। শুধু শক্তি দাও!

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মায়ালতার অসুখের খবর পাইয়া, মহিম কর্ম্মস্থান হইতে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতেই বুঝিল এ যাত্রা মায়ালতার আর নিস্তার নাই। সন্তান প্রসবের পর তাহাকে কাল সূতিকা রোগে ধরিয়াছিল। মায়ার অনুরোধ মত প্রিয়বালাকে পত্র লিখিল ও লোক পাঠাইল। কিন্তু মায়ার মাকে এ নিদারুণ সংবাদটা কিছুতে লিখিতে পারিল না; মহিম বেশই জানিত, মায়া তাহার অভাগিনী মাতার কতখানি!

পত্রে বাড়াবাড়ির খবরটা আদৌ লিখিতে পারিল না—শুধু লিখিল—অসুখ হইয়াছে।

মায়া এদিকে রোজই জিজ্ঞাসা করিত, মাকে পত্র লেখা হইয়াছে কি না? মায়ের সহিত শেষ দেখাটা করিবার জন্য কত যে তাহার ব্যগ্র কামনা, তাহা তাহার একটা একটা দীর্ঘশ্বাস একটা একটা বাক্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল।

চরম অবস্থা দেখিয়া, মহিমকে বাধ্য হইয়াই অবশেষে চরম খবরটী মায়ার মায়ের কাছে পাঠাইতে হইল! মা নিশ্চয় আসিবে শুনিয়া মায়ারও ভরসা হইল, ভাবিল, যদি কেহ না তাহার পুত্রের ভার লইতে আসে, মায়ের হাতেই বুকের নীলমণিকে সঁপিয়া দিয়া যাইবে।

শ্বাশুড়ীর ত অবসর নাই। তাঁহার আর পাঁচটী রহিয়াছে।—

ডাক্তারেরা কহিল। রোগটা কখনই এতটা প্রবল হইত না। রোগিণী যদি গোড়া হইতে একটু সাবধান হইতেন।

মহিম কিছুতে বুঝিতে পারিল না, যে মানুষ সাধ করিয়া আপনার জীবন বৃন্তে কুঠারাঘাত করিতে পারে!

তবু একদিন একথা মহিম মায়াকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল। মায়া মহিমের হাতটী ধরিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিল। ডাক্তারদের কথা শোনেন কেন? ডাক্তাররাই কি সব সময়ে ঠিক কথা বলিতে পারে?

মহিমেরও কিন্তু কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল মায়া সাধ করিয়াই যেন স্বেচ্ছায় এ সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে! যেন তাহারই জন্য এ সংসারে কোথায় একটা ব্যথা জমিয়া উঠিয়াছিল। সেটী সে নিজেই দুই হাতে ঠেলিয়া আস্তে আস্তে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইতে চায়। তবু সাহস করিয়া একথা, মায়াকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল, যদি প্রিয়বালা কখনও আসে, তবে প্রিয়বালাকে লইয়া একথা তুলিব। সত্যই তাই কি না।

সেদিন কালীপূজার দিবস। রাত্রে পূজা হইবে। সকাল হইতে নানা স্থানে নানা সময়ে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিয়া তারপর নীরব হইয়া গিয়াছে, আবার সন্ধ্যার সময় বাজিয়া উঠিবে। মহিম আপনার শিশু-পুত্রটীকে বক্ষে করিয়া, বাড়ীর সদরের সামনেটায় পায়চারি করিয়া

বেড়াইতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এবং দুই এক জায়গায়—গ্রামান্তর হইতে পূজার বাদ্যটাও ঘোর ঘটাপূর্ণ হইয়া সন্ধ্যাকাশ প্লাবিত করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। মহিম একবার জগতের আনন্দের সহিত আপনার নিরানন্দ কুটীরের আনন্দটী মিলাইয়া লইল!—হায়, তাহার আজ আনন্দ কোথায়? সম্মুখে যেমন কাল নিশিথিনী তিমিরাবরণে অবগুণ্ঠিত হইয়া জগতের উপরে মসীলিপ্ত এক শান্ত সমাহিত তামস স্তব্ধতা ছাড়াইয়া আনিতেছিল, তাহারও বক্ষের পরে, তেমনি একটা, মহাভার মহাকালের সহ সহনশীল পাষাণ ভার, আস্তে আস্তে তাহার বুকের উপর, জাঁতার মত বসিয়া যাইতেছিল!—

যে জীবনে আনন্দ ভিন্ন আর কিছু নাই ভাবিয়াছিল, সে জীবনে আজ কোথায় আনন্দ? মায়াও যদি চলিয়া যায় এবং প্রিয়বালাও না আইসে, তাহা হইলে, আনন্দের ত এইখানেই পরিসমাপ্তি! বুকের শিশুটীও যেন প্রবল একটা ভারের মত হইল।

এমন সময় হুম হুম করিতে করিতে একখানা পাল্কী আসিয়া তাহাদের দুয়ারের কাছে থামিয়া গেল।

মহিম অগ্রসর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই দেখিল, তাহার শ্বশুর বাড়ীর ভৃত্য রাইচরণ "রাম রাম" করিয়া মাথা নোঁয়াইয়া, মহিমের কুশল সংবাদ লইল।

মহিম বুঝিল যে প্রিয়বালা আসিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল কিন্তু প্রিয়বালা আসিবেই না। অকূল সাগরের মধ্যে যেন একটী কূল পাইয়া বাঁচিয়া গেল। তাহার কেবল ভাবনা হইতেছিল, ভবিষ্যতে এই মাতৃহীন শিশুটীকে লইয়া সে কি করিবে? ইহাকে দেখিবারমত মায়েরও ত সে অবসর নাই!

প্রিয়বালাকে দেখিয়াই তাহার রুদ্ধ হৃদয় যেন এক মুহূর্ত্তে উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠিল! কোনরূপ দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া, একবারেই বলিয়া উঠিল,—"বড় বৌ এ'লে? আমি এতক্ষণ তাই ভাব্‌ছিলাম! এই নাও তোমার ছেলে নাও। আমায় অব্যাহতি দাও" বলিয়া কোল হইতে শিশুপুত্রকে নামাইয়া প্রিয়বালার সম্মুখে ধরিল।

প্রিয়বালা চকিতে একবার ঘোমটার মধ্য হইতে স্বামীর দুশ্চিন্তা-কাতর মুখখানির দিকে চাহিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই সাগ্রহে পুত্রটীকে বুকে লইয়া, বাড়ীর দিকে চলিল!

পাল্কীর শব্দে প্রতিবেশী যে দুই একজনা ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

মহিমেরও হৃদয়টী অশ্রু বাষ্পে উদ্বেল হইয়া উঠিল!

মা-ক্ষেমঙ্করী, ইতিপূর্ব্বেই পাল্কীর শব্দ শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন, বড়-বৌ আসিল, এবং নিজের ছোট ছেলেটীর মুখে সে সংবাদ শুনিয়া সে সম্ভাবনাটী একবারেই পাকা হইয়া গেল! তিনি রোগিণী মায়ালতার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় বড়বৌ নীল-মণিকে কোলে করিয়া তাঁহার পদনিম্নে প্রণত হইয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেমঙ্করী বউএর কুশল লইয়া কহিলেন, ভাল ছিলে ত মা বেশ। তোমার বাপ মা বেশ ভাল আছেন?

প্রিয় কহিল—হাঁ।

ক্ষেমঙ্করী আর কিছু না বলিয়া, নীরব আহ্বানে প্রিয়বালাকে মায়া-লতার ঘরের দিকে ডাকিলেন।

মহিম ইতিপূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উদ্বেলিত স্বরে মায়াকে ডাকিয়া কহিল,—নতুন বৌ তোমার দিদি, এ'লো; চিনতে পাচ্চো?

মায়ার রোগটী প্রবল হইলেও, জ্ঞানটী তাহার পরিষ্কার ছিল, কষ্টে

বালিশে ভর করিয়া উঠিয়া কহিল, হাঁ, এই যে দিদি খোকাকে কোলে ক'রে এ'লেন। খানিক অতৃপ্ত দৃষ্টিতে প্রিয়বালার দিকে, চাহিয়া তারপর তাহার ক্ষীণহস্ত প্রসারিত করিয়া, প্রিয়বালার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া কহিল,—দিদি এ'লে? এতদিনের পর এ'লে? আজ যদি না আসতে, তা হ'লে বোধ হয় আর দেখাও হ'তো না! ব'সো দিদি, বলিয়া তাহার কাপড়ের অঞ্চলটী ধরিয়া কাছেই বসাইল।

শ্বাশুড়ী ক্ষেমঙ্করী, ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। তাঁহারও বসিবার অবসর নাই। গৃহস্থালীতে তিনিই একা! প্রতিবেশিনীদলও পূজার আয়োজনে আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে রহিল কেবল তিনি জন! মহিম, মায়ালতা, আর প্রিয়বালা এবং প্রিয়বালার কোলে তাহাদের শিশু পুত্র নীলমণি—

আজ তিন জনেই অভিযুক্ত, তিন জনেই অপরাধী, যমরাজা তাহাদের বিচার করিতেছেন! মহিম কিছু দূরের খাটখানাতে হেলান দিয়া অশ্রু বাষ্পাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল!

প্রিয়বালা চাহিয়া দেখিল, হাঁ সতীনের রূপ বটে, মৃত্যু যদিও ইতি মধ্যে সে রূপের বার আনা গ্রাস করিয়াছে, তবু সিকি রূপেই ঘর আলো হইয়া রহিয়াছে। মহিমের দিকে একবার চাহিয়া, আবার মায়ালতার দিকে ফিরিয়া বসিল। মায়ালতা কহিল,—অনেক কথাই বলবার ছিল দিদি, কিন্তু আর সে সময় নাই! যাই হোক তবু যে তোমার স্বামী পুত্র আবার সব হ'লো এ সুখে আমার আর কোন যন্ত্রণা নাই। বলিয়া খানিক স্তব্ধ থাকিয়া, কহিল, কিন্তু তুমিও ত দিদি ছোট বোনটীকে আপনার ব'লে ডাকতে পার্লে না,—কেবল ভাবলে সতীন। সত্যি দিদি তা নয়। আমি এতদিন কেবল তোমার সংসার তোমা'

ছেলে তোমার স্বামীই দেখে আসছিলাম। ভগবান যেন সেই উদ্দেশ্যেই আমায় পাঠিয়েছিল! তোমার ছেলে ছিল না। ভগবান আমাকে দিয়ে তোমার সে ছেলেটীও পাঠিয়ে দিলেন। এখন দেখ দেখি, কেমন মানিয়েছে, ঐ স্বামী এই পুত্র, এই ঘরকন্না, না ও দিদি! আমার পালা সাঙ্গ হ'য়েছে, এইবার তোমার পালা আরম্ভ হ'লো!

প্রিয়বালা এতক্ষণ পর্য্যন্ত শুষ্ক কঠোর হইয়াছিল। সেও আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোক দিয়া আপনি জল বাহির হইয়া গেল। সবলে মায়ার হাতটী চাপিয়া কহিল,—না দিদি যাবে কেন? এ সংসার স্বামী পুত্র ত তোমার, আমি যেমন এসেছি, তেমনি মাঝে মাঝে দেখতে আসবো, তাইতে আমার যথেষ্ট সুখ!—

মায়া কম্পিত কণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না দিদি আমার নয়, ককৃখনো আমার নয়! আমিই তোমার সোণার সংসারে উড়ে এসে যুড়ে ব'সেছিলাম! কিন্তু কি ক'রবো, উপায়ও ছিল না, এখন খালাস পেয়ে মনে হ'চ্চে, তোমার ঋণ হ'তে মুক্ত হ'লাম। বলিয়া নিতান্ত নির্জ্জীব ভাবে বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল।

প্রিয় বালিশটী একটু ঠেলিয়া দিল।

বালিশটী ঠেলিয়া দিতে শিশুপুত্রটী কাঁদিয়া উঠিল।

মহিম কহিল, দাও, ওর মাকে একবার দাও, শেষবার বুকে ধ'রে নিক্।

প্রিয়বালাও দিতে গেল!

কিন্তু মায়া দুইহাত নাড়িয়া বারণ করিয়া কহিল—উহুঁ, আর প্রয়োজন নাই। যাঁর ধন তারই হ'লো। আর আমায় কেউ কিছু ব'লো না, আর কিই বা আছে, শুকনো বুকে একবিন্দু দুগ্ধ নাই, বলিয়া পুত্রের দিকে ঈষৎ বাষ্পকুলনেত্রে চাহিয়া তারপর যেমন অলসে

ঘুমাইয়া পড়ে তেমনি ঘুমাইয়া পড়িল! শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের উপর প্রদীপের রশ্মিটী সে কি সকরুণ উজ্জ্বল বিলাপগাথার মত পবিত্র হইয়া উঠিল!

প্রিয়বালা পুত্রকে দুধ খাওয়াইয়া কাজল দিয়া চুমো খাইয়া নিজের বক্ষের দোলাতেই ঘুম পাড়াইয়া রাখিল।

শাশুরী আসিয়া একবার কহিয়া গেলেন খোকাকে মেঝেতে মাদুরের উপর শোয়ালে না কেন বড় বউ?

প্রিয়বালা কহিল। না এই থাক না? আমার ত এতে কিছু অসুবিধা বোধ হচ্ছে না? আর অসুবিধা হইলেই বা শোনে কে; বহুদিনের পর তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়টা যে আজ অমৃতের স্পর্শ পাইয়াছে, বুকের রত্ন আর কি সে বুক হইতে নামাইতে পারে? একটা অদৃশ্য মায়ার শৃঙ্খলে সে আপনার অজ্ঞাত-সারে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল!

গভীর রাত্রিতে যখন সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন মায়া একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল মা!

বহু দিনের পর প্রিয়বালা ও মহিম রোগিনীর পার্শ্বে এক বিছানায় শুইলেও উভয়ে সজাগ ছিল, তাহারা উভয়েই শঙ্কা করিতেছিল মৃত্যু আসিয়া কখন এই শুভ্র সুন্দর জীবনটীকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। আবার এই মৃত্যুর স্রোতই তাহাদিগকেও এক স্থলে মিলিত করিয়াছিল! প্রিয় তাড়াতাড়ি মায়ার শীতল হাতটি চাপিয়া কহিল, কি হচ্ছে বল দেখি মায়া, বোন আমার?

মায়া কহিল, হবে আর কি দিদি! মায়ের সঙ্গে একবার দেখাটা হ'লো না?

প্রিয় কহিল, পত্র গেছে; তুমি ভাল হও, দেখা হবে বৈকি।

মায়া একবার কষ্টে পাশ ফিরিয়া কহিল, না দিদি, দেখা আর হবে

না, আমার বড় দুখিনী মা, আমি ভিন্ন মায়ের আর কেউ ছিল না। এখন তুমিই তাঁর মেয়ে হ'লে, কেমন দিদি? অনাথিনী যাকে মা ব'লতে পারবে ত?

প্রিয়বালার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মায়া মহিমের দিকেও একটী সকৃতজ্ঞ চাহনি চাহিয়া কহিল, একবার সামনের জানলাটা খুলে দিতে পারবেন? অভাগিনীর জন্য আপনি কতই করেছেন, আপনার দয়ার অন্ত নাই, আপনার ঋণ আমি জন্ম জন্মান্তরেও শুধিতে পারবো না। আপনি আমার মায়ের জাতি রক্ষা করেছেন। আরও কত কি যেন তাহার বলিবার ছিল, বলিতে পারিল না—অতি ভক্তি ভরে দুই হাত দিয়া মহিমের পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল।

মহিম জানলাটী খুলিয়া দিয়া আবার বিছানার ধারটীতেই আসিয়া বসিল। পূজা বাড়ীর দালানে তখনও দুই একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল. তাহাদের ম্লান আভা ম্লান নিশিথীনী অঙ্কে মিশিয়া গিয়াছিল! আকাশের উপরে একটা ভাস্বর নক্ষত্র তাহার দীপ্ত আভা বিকীর্ণ করিতে করিতে গৃহ কোণের এই নক্ষত্রটীর পানে চাহিয়া চাহিয়া কোন্ অনন্তের পথে মিশিয়া যাইতেছিল।

মায়া একটী হাত তাহার দিদির বক্ষেরপরে শিশুটীর উপরে, আর একটী হাত মহিমের পায়েরপরে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল!

মহিম প্রিয়বালার দিকে চাহিয়া বাষ্পাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল! বড় বৌ, তবে সত্যই মায়লতা মায়া কাটিয়ে চলে গেল! কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু ভগবান্ কেন যে আমার বুকের মাঝে এতটা মায়া জমিয়ে থুলেন, তা তিনিই জানেন! সেই ত তুমি সেই ত আমি কাছে রয়েছি, কিন্তু মাঝে কেন এ মৃত্যু সরোবর! কেন এ মায়ার শৃঙ্খল?

প্রিয়বালাও অশ্রুরুদ্ধ স্বরে ছুবার ডাকিল, মায়া!—মায়া!—দিদি আমার। কিন্তু হায়, আর সে স্বরে কেহ সাড়া দিল না!

* * * * *

ভোরের বেলায় যোগনাথ বাবু পুত্র বধুর সৎকারের জন্য লোক ডাকিতে যাইতেছিলেন এমন সময় ভৃত্য সঙ্গে এক প্রৌঢ়া রমণী অবগুণ্ঠিতা হইয়া হাতে কিছু মিষ্টান্ন ও ফল মূল লইয়া, যোগনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন। ঐটেই কি যোগনাথ বাবুর বাড়ী?

যোগনাথ কহিলেন হাঁ। আপনি কোথা হ'তে আসছেন বলুন দেখি?

অবগুণ্ঠিতা রমণী কহিলেন। কলিকাতা হইতে। আপনি ব'লতে পারেন আমার মেয়ে কেমন আছে? এখানে তার বড় অসুখ হয়েছে শুনেছি! আমি মনে করেছি এবার তাকে নিয়ে যাবো।

যোগনাথ বুঝিলেন যে তাঁহার বেহানই ইনি, কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, অথচ অভাগিনীর সবই ত শেষ হইয়া গিয়াছে।

যোগনাথ কহিলেন আসুন আমার সঙ্গে সব ভাল আছেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, বউ মা, এসো ত একবার বাছা, তোমার মা এসেছেন।

মৃত আগলাইয়া সকলেই বসিয়া ছিল, এমন সময় মায়ের নাম শুনিয়া প্রিয়বালা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল, এই যে মা, আমি তোমার মেয়ে।——

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই, চাহিয়া দেখিল, রমণীর মুখ একবারে মৃত্যু কালিমায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অশ্রুহীন অপলক দৃষ্টিতে একটা, প্রাণের স্পন্দনও নাই।

সম্পূর্ণ।